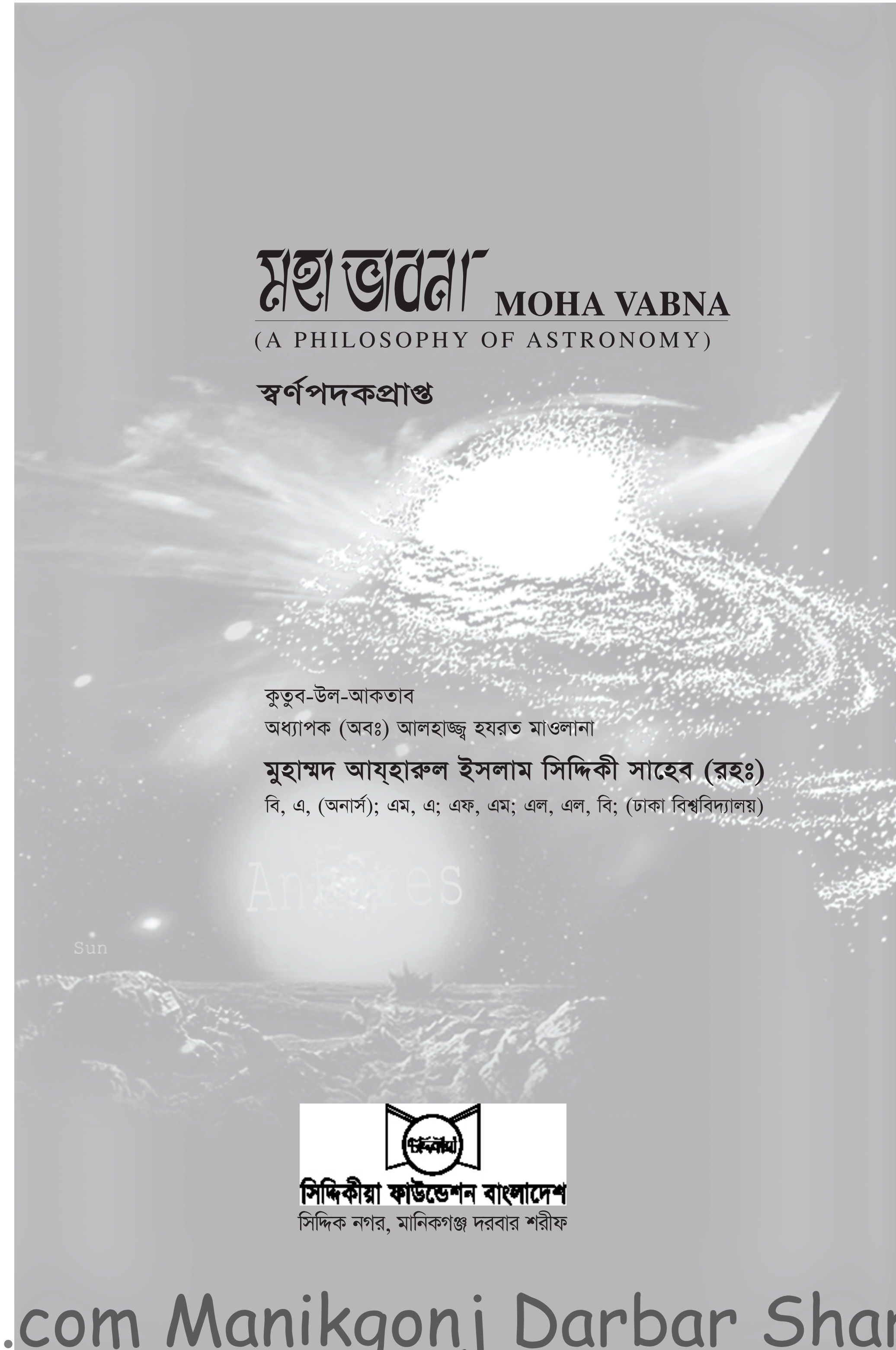


মহা ভাবনা MOHA VABNA

(A PHILOSOPHY OF ASTRONOMY)

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত

কুতুব-উল-আকতাব
অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)

বি, এ, (অনার্স); এম, এ; এফ, এম; এল, এল, বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ

প্রকাশক
মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মন্যুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

MOHA VABNA (A Philosophy of Astronomy)
Written by the great muslim scientist & religious leader of Bangladesh
Prof. Alhajj Hazrat Maulana Muhammad Azharul Islam Siddiquee (Rh.)
Peer Saheb, Manikgonj Darbar Sharif

Published by
Alhajj Hazrat Maulana D. Muhammad Manzurul Islam Siddiquee
Peer Saheb, Manikganj Darbar Sharif
Principal, Zamia Arabia Siddiquea Darul Ulam Madrasa (Siddique Nagar, Manikgonj)
Chairman, Siddiquea Foundation Bangladesh

১ম প্রকাশ	ঃ	১৪১১ হিজরী, ১৯৯১ ইংরেজী
৭ম সংস্করণ	ঃ	১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইংরেজী
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	গ্রন্থকার
গ্রাফিকস্ ডিজাইন	ঃ	কম্পিউটার প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক
অক্ষর সংযোজন	ঃ	সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
মুদ্রণে	ঃ	জেনিসিস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা, E-mail: genesisl@bdcom.com
মূল্য	:	পেপার ব্যাক টাকা ৭০/-, বোর্ড বাঁধাই ৯০/-
Price	:	Paper Back Indian Rs. 70/-, Board Binding 90/- Europe 7 Euro, US $ 7

ISBN-984-32-1182-0

ভূমিকা

পৃথিবী সৃষ্টি হতে অদ্যাবধি যত মানুষ এই দুনিয়ায় এসেছে, প্রত্যেকেরই চিরন্তন প্রশ্ন, আমি কে? কোথা থেকে আমি এসেছি? কোথায় আমি যাব? আমার সৃষ্টিকর্তাইবা কে? মানুষ সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়না। পৃথিবী পেরিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব-মহাবিশ্ব আবিষ্কার করে তার সীমানা অন্তহীন করে চলেছে। কিন্তু তার মনে চিরদিন একটা প্রশ্ন থেকে যায়, এই মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষের কিবা অস্তিত্ব এবং কতটুকু তার পরিমাণ! বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ মহাবিশ্বের তুলনায় কতটুকু এবং কেন তাকে সৃষ্টির সর্বসেরা জীব হিসেবে ঘোষণা করা হল। এসব প্রশ্ন নিয়ে, বিশেষ করে এই অনন্ত মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের কিভাবে সম্পর্ক হতে পারে এবং যোগসূত্র সৃষ্টি করা সম্ভব, তারই বিশদ বিষয় এই বইতে আলোচিত হয়েছে। মানুষ যদি তার ভেতরের অত্যাশ্চর্য কারুকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে সে দেখতে পাবে যে মহাবিশ্বের ধারণাতীত সৃষ্টিরাজির চেয়ে তার নিজস্ব শিল্পকলা অনেক বেশি বিস্ময়কর। আর মানুষ তার আত্মিক শ্রেষ্ঠত্বকে জাগ্রত করে সেই মহামহিম অনন্ত অসীম মহাস্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আর এই যোগাযোগ স্থাপনের দ্বারাই তার চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর পাবে। আর এসব বিষয়ে জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), দর্শন (Philosophy) ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, যাতে মহাস্রষ্টাকে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি, তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে পাঠককুল গ্রহণ করলে শ্রম সার্থক মনে করব।

লেখক

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, পীরে কামেল ও মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, শাহ্ সুফি অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) বি.এ. (অনার্স); এম.এ; এফ.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক রচিত "মহা-ভাবনা" নামক গবেষণামূলক বিজ্ঞানভিত্তিক মহা-কিতাবখানি প্রকাশনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ্।

"মহা-ভাবনা" নামক মহা-কিতাবে সমগ্র বিশ্বে এই প্রথম মহান আল্লাহপাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক মহা সাধনা বা জিকিরের সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। যুগশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় এ মহা-কিতাবে মহাসৃষ্টির জগতের মহা-স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে।

প্রকাশনার কাজে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। সবার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল কামনা করি।

প্রকাশনার ব্যাপারে অনিচ্ছাস্বত্বেও কিছু কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, সুধী পাঠকমহল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটা একান্তভাবে কাম্য।

প্রকাশক

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, পীরে মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) ১৯৩৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঘিওর থানার তেরশ্রীর পয়লা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ্ব অধ্যাপক হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ নছিমুজ্জামান সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ), যিনি তেরশ্রী কলেজের একজন অত্যন্ত উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষক ও হাক্কানী আলেম ছিলেন, তিনি উর্দূ কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। মোর্শেদ কেবলার মাতার নাম সৈয়দা মালেকা সিদ্দিকা (রহঃ) তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারী ও একজন পরহেজগার তাপসী ছিলেন। মোর্শেদ কেবলার দাদাজান ডাঃ সৈয়দ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) তৎকালীন একজন খ্যাতনামা বিলেত ফেরত সার্জন ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মরণ-শক্তি সম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যার ফলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী খুব যত্ন সহকারে তাঁকে পাঠদান করাতেন। তিনি ১৯৫১ সালে ফাযেল পরীক্ষায় বোর্ডস্ট্যান্ড করেছেন। উল্লেখ্য যে, তখন সমগ্র পাকিস্তানে মাত্র ৪৭ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি অধ্যায়নের পাশাপাশি জেনারেল বিষয়াদিও অধ্যায়ন করতেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে সম্মানের সহিত বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পাশাপাশি এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় মনোযোগ দেন। মানবিক বিভাগের মেধাবী ছাত্র হলেও তিনি বিজ্ঞান ও আরবী বিভাগের জ্ঞানার্জনে বেশী আগ্রহী ছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানীতে জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি আরবী ভাষায় মহাপান্ডিত্য অর্জন করেন, যার ফলশ্রুতিতে

দেশ বিদেশের বহু বরেণ্য আলেম ওলামাগণ নিজ নিজ অর্জিত এলেমকে আমলে পরিণত করার জন্য তালিম ও তাল্‌কিন নিতে তাঁর নিকট ছুটে আসতেন।

তিনি বরাবরই শিক্ষকতাকে পছন্দ করতেন। পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১৬ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিটি এতই অভিনব ও মানসম্মত ছিল যে, যখন তিনি ক্লাসে পড়াতেন তখন অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা তাদের ক্লাস বাদ দিয়ে তাঁর ক্লাস করতে ছুটে আসতো। উল্লেখ্য যে, কোন ছাত্র কখনই বাসায় এসে ক্লাসে পড়ানো বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়নি। তবে তিনি ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়াতেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র এক্জামিনার ছিলেন। তিনি সম্মিলিত পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের 'সাইকো এনালাইসিস এসোসিয়েশনের' জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক মহাসাধনা

অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই আধ্যাত্মিক মহাসাধক জন্মগত আল্লাহ্‌র ওলী ছিলেন। বড় বড় আল্লাহ্‌র ওলীগণ (কুতুব-উল-আকতাব) দুনিয়াতে আসার পূর্বে আল্লাহ্‌পাকের মহাসৃষ্টি জগতের সব কিছু ঐ আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য সব সময় দোয়া করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহ্‌পাক দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে পিতা-মাতা, ওস্তাদ অথবা সে সময়ের কোন আধ্যাত্মিক সাধককে অবগত করান। তিনি যখন মাতৃগর্ভে আসলেন তখন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া মা স্বপ্নে দেখলেন "স্বয়ং দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাসি মুখে এসে একটি সুন্দর লাল গোলাপ তার হাতে উপহার দিলেন এবং সাথে সাথে বেশ কিছু লাল আলো চতুর্দিকে ছড়াচ্ছিল এবং চারিদিক উজ্জ্বল হয়েছিল" (আলহামদুলিল্লাহ্)। হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন - "আমাকে যদি কেহ স্বপ্নে অথবা বাস্তবে দেখে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম"। শুধু স্বপ্নে দেখলেই জাহান্নামের আগুন হারাম আর হাসি মুখে ফুল দিলে কি হতে পারে-, সাধনা'রত মোকাম্মেল পীরের জ্ঞানী ভক্তবৃন্দ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। যে বিছানায় শিশু মোর্শেদ কেবলা ঘুমাতেন সেই বিছানার পাশের জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পরতো, কিন্তু একটি সাপ এসে জানালায় এমন ভাবে পেচিয়ে ফনা ধরে ছিল, যাতে আল্লাহ্‌র অলীর গায়ে রোদ না লাগে (আলহামদুলিল্লাহ্)। এ ঘটনা দেখে তাঁর পিতা বললেন, "ছেলে হিসেবে খোদা আমাকে একটি রত্ন পাঠিয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সুসংবাদ পেয়েছি যে, আমার এ ছেলের যমানায় ইসলামী দর্শনে ওর চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ হবে না (আলহামদুলিল্লাহ্)"।

খুব ছোট বয়সেই তিনি নির্জনে একা বসে সৃষ্টিজগতের অপূর্ব এই মহাসৃষ্টির মহা

স্রষ্টাকে খুজতেন, আর অঝোরে চোখের পানি ঝরাতেন ও বলতেন কে আমাকে বানিয়েছেন আমাকে দেখা দেন। যখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি ভাবলেন আল্লাহ্‌পাককে পেতে হলে আরবী মাধ্যমে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাই তিনি ইংরেজী মাধ্যমের পাশাপাশি মাদ্রাসা বিভাগের পড়া শেষ করেন।

তিনি ১৯৫১ সালে হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল গণি সাহেব (রহঃ) (বনবাসী দরবেশ) এর নিকট বয়াত (মুরিদ) হন এবং ৯ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে সাধনার পর হুজুর কর্তৃক কাদ্‌রীয়া তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর নির্দেশেই চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব হুজুর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক সাহেব (রহঃ) শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার (যিনি পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পরতেন) নিকট বয়াত গ্রহণ করেন ও এলমে মা'রেফতের জগতে গভীরভাবে বিচরণ করেন এবং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আদব জ্ঞান সম্পন্ন এ মহান আল্লাহ্‌র ওলী তাঁর সঠিক সাধনার মাধ্যমে মাত্র ৩ বছরের মাথায় চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং ১৩ বছর শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার নিকট সাধনা'রত ছিলেন। বরিশালের হুজুর কেবলা তাঁকে আদর করে "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব" নাম ধরে ডাকতেন এবং মাহ্‌ফিলে শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লা মোর্শেদ কেবলাকে সকল মানুষের সামনে বলতেন "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব খাড়াও (দাঁড়াও) মানুষরে দেহাও (মানুষকে দেখা দাও), এই আয্‌হার আমার কলিজার টুকরা"। মোর্শেদ কেব্‌লা শ্রেষ্ঠ চিশতিয়া ও কাদ্‌রীয়া উভয় তরীকা থেকেই খেলাফত (সনদ) প্রাপ্ত হন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব (রহঃ) (শায়েখ- জামে'আয়ে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ, ঢাকা) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)-কে বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছি, মা'বুদ একজন ইংরেজী বাংলা শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষকে আপনি এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেন। আমার এ দোয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট যে কবুল হয়েছে, তার প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং আপনি। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন।" (আলহামদুলিল্লাহ্)

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা

১৯৬৫ সালে বরিশালের হুজুর কেবলা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক (রহঃ) এর হুকুম ও দোয়ার মাধ্যমে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন ও সমগ্র বিশ্বে ইসলামের এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের আলো ছড়িয়ে দেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। মাইলের পর মাইল, কখনো পায়ে হেটে, কখনো সাইকেল চালিয়ে হুজুর কেবলা মাহ্‌ফিল করতে যেতেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে আনতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশালের হুজুর কেবলা জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কখনোই নিজের নামে বয়াত (মুরিদ) করেননি, এটা তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। সমাজে হাক্কানী আলেম তৈরীর লক্ষ্যে এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ১৯৭৭ সালে জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে আদব, এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফত ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আরবী, উর্দু, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিম দেয়া হয়। আধ্যাত্মিক জগতের এই দিকপাল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিত করে মহান আল্লাহ্‌পাকের সাথে ভালবাসা স্থাপন করেছেন। মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ হচ্ছে হুজুরপাক (সাঃ)-কে ভালবাসার এবং তাঁর সুন্নতকে সঠিকভাবে মানার দরবার শরীফ। তিনি প্রতি বছর অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে দুইবার বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনের আয়োজন করেন। যেখানে মাত্র তিন দিনে মানুষকে এলমে মা'রেফত ও এলমে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা হুজুরপাক (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ সুন্নত পালনের জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা দান করা হয়। যেখানে দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও ভক্তবৃন্দ এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফতের তালিম নিতে এবং নবীপ্রেমে মশগুল হয়ে সুন্নতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পাগলের মত ছুটে আসেন। এখানে পর্দা, আদব, আখলাক, এলেম থেকে শুরু করে তাসবিহ্‌, পাগড়ী, মেস্‌ওয়াক পর্যন্ত সকল সুন্নতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নেয়া হয়। দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন আলেম-ওলামাগণ মন্তব্য করেছেন- "মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ সুন্নত ও আদবের দরবার"। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ। তার বাস্তব প্রমাণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে গেলে স্বচক্ষে অবলোকন করা যায়।

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও আলেমের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমানে মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মদ মন্‌যুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পিতার নির্দেশ ও দোয়ার মাধ্যমে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলন ও মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ অবিকল পিতার মতই পরিচালনা করছেন। বর্তমান পীর সাহেব কেবলা (আব্বা হুজুর) সম্পর্কে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "তোমাদের জন্য আমি দরদভরা একজন দরদী মনের মানুষকে রেখে গেলাম, আমি আমার আমলে যতটুকু ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করেছি আমার আদরের ছেলে, আল্লাহ্‌র বান্দা তার আমলে এর চাইতে দশ গুন বেশী প্রচার এবং প্রসার করবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া। ছেলে শক্তিশালী হলেই পিতা শক্তিশালী হয়। আমার এ ছেলে আল্লাহ্‌র বান্দা দুনিয়াতে আসার পূর্বে আমি চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছিলাম মাবুদ আমাকে একটি ছেলে সন্তান দেন আমি এই সন্তানকে ইসলামের কাজের জন্য নিয়োজিত করবো, আল্লাহ্‌পাক আমার এ দোয়া কবুল করেছেন" (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। যেই মহান আল্লাহ্‌র ওলী চোখের পলকে একজন জাহান্নামী মানুষকে আল্লাহ্‌র ওলী বানাতে পারতেন সেই মোর্শেদ কেবলা চোখের পানি ঝরিয়ে যাকে দুনিয়াতে এনেছেন সেই মানুষটি কেমন হতে পারে জ্ঞানী মানুষ খুব সহজেই তা বুঝাতে পারেন। আমরা সবাই যেন এই মহানেয়ামতের সঠিক কদর করতে পারি। উল্লেখ্য যে, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের সকল ভক্তবৃন্দ ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ, কারণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের পীর সাহেব হুজুর, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে অন্যতম। পাক-ভারত উপমহাদেশে এত উচ্চ শিক্ষিত পীর নেই বললেই চলে। একজন খাঁটি আল্লাহ্‌র ওলি, জাইয়েদ আলেম ও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সহ্‌বতে এসে মহান আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকলে আমন্ত্রিত।

গবেষণা ও কিতাবসমূহ

যখন বিজ্ঞান চর্চার উপর না-জায়েযের ফতোয়া ছিল, চশমা ব্যবহারটাকেও জায়েয হবে না বলে মনে করা হতো, গোড়া আলেম ও ভন্ড পীরদের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছিল, ঠিক সে সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণা করে যুগান্তকারী বিজ্ঞানভিত্তিক মহা কিতাবসমূহের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বিদূরিত করেছিলেন। সেই মহা কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

সমাজের নর-নারীকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও চরিত্রবান আদর্শ নর-নারীর সুশৃংখল জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসাবে কোরআন শরীফ ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে ১৯৭৪ সালে সমাজকে উপহার দিলেন "বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা" নামক মহাগ্রন্থটি এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন পর্দা শুধু ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য অপরিসীম

কল্যাণ বয়ে আনে। যার ফলে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছে। এমনকি এই কিতাব পড়ে অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত পর্দা (বোরখা পরে) করা শুরু করেছে।

তারানায়ে জান্নাত

তিনি ১৯৮১ সালে "তারানায়ে জান্নাত" বা বেহেশ্তী সূর নামক অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব প্রকাশ করে মহাকবির পরিচয় দিয়েছেন। যা সালেককে আল্লাহ্পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। তারানায়ে জান্নাত স্মরণ করিয়ে দেয়, ৯৯৯ সালের দিকে "মহাকাব্য শাহনামার" লেখক মহাকবি ফেরদৌস সাহেব, আনুমানিক ১২০৫ সালের "গুলিস্তার" লেখক আল্লামা শেখ সা'দী সাহেব (রহঃ) এবং ১২৩৭ সালে "মসনবী শরীফের" লেখক মহাকবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী সাহেব (রহঃ)-র মত মুসলিম মহাকবিদের অমর কীর্তির কথা।

মহাস্বপ্ন

হুজুরপাক (সাঃ) এর পর সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ শত বছর পর তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহাস্বপ্ন" নামক কিতাবে একটি হাদিস শরীফের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ্য দশ বছর নিরলস গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞানকে উপহার দিলেন 'মহাস্বপ্ন' নামক বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকিতাব। যা ইতিহাসে ইসলামের নাম উজ্জ্বল করে রাখবে।

এই কিতাবে তিনি বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings)। "মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় না, একটি মানুষ কোটি কোটি **পরমাণু-মানুষে** রূপান্তরিত হয় এবং তারা অনুভূতি নিয়েই দেখতে ও শুনতে পায়" আবিষ্কার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন ইসলামের মহা মনীষীদের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত। এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন ৭৬৮ সালে রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান সাহেবের কথা, যার লিখিত "আল-কিমিয়া" নামক মহাকিতাব থেকে পরবর্তীতে রসায়নের (Chemistry) জন্ম, তিনিই প্রথম সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। আল-বাত্তানী সেই ৮৯০ সালেই ত্রিকোণমিতির সাইন (SinA), কোসাইনের (CosA) সাথে ট্যানজেন্টের (TanA) সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড = এক সৌর বছর প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, এবং টলেমীর বহু থিওরী সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আনুমানিক ১০১৫ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আবু আলী ইবনে সিনায় লিখিত মহা-কিতাব "আল কানুন ফি আল টিব্ব" (যা ছিল ১৭৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্য বই) এর ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ বিজয়ের কথা। একজন নবীন বিজ্ঞানী ও গবেষক "মহাস্বপ্ন" নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন "মহাস্বপ্ন" নামক মহাকিতাবটি প্রায় ৫০০ বছরের ভিতরে অন্যতম মুসলিম মহাবিজ্ঞানীর আবিষ্কার যা বিজ্ঞানের মত ধারাকে পরিবর্তন করবে। উল্লেখ্য ১৯৮৭ সালে এই মহাবিজ্ঞানী মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "মানুষের আঙ্গুলের একটু অংশ কেটে ফেললে ঐ কাটা অংশ থেকে অসংখ্য মানুষ তৈরী করা সম্ভব"- যা পরবর্তীতে ক্লোন থিওরীর রূপ নিল এবং ডলি নামক ভেড়া তৈরী করা হল। মানুষ তৈরীর গবেষণা চলছে। "মহাস্বপ্ন" সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমার মহাস্বপ্ন নামক চটি বইখানা যদি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কয়েকটি ৫ টনি ট্রাক ভরা কিতাব হবে।

জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব (A Philosophy of Physiology)

১৯৮৮ সালে তিনি "জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব" (A Philosophy of Physiology) নামক কিতাবের মাধ্যমে জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং আল্লাহ্র পথে এসেছে।

মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব

১৯৮৯ সালে "মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব" নামক মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তথ্য ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব লিখেন, যা চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার সালেকদের পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মহা ভাবনা (A Philosophy of Astronomy)

মহান আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহা-ভাবনা" (A Philosophy of Astronomy) নামক মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যা বিশ্বের নাস্তিকদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এ কিতাবটিতে। এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। উল্লেখ্য তিনি ১৯৯৯ সালের ১৩ই মার্চ সমগ্র বিশ্বের প্রায় ২০০ ডক্টরেট ও মুসলিম দার্শনিকগণের মাধ্যমে যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী সাহেব কর্তৃক স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ডাঃ হারুন-অর-রশিদ সাহেবের (লেকচারার, ডি.এম.সি) মতে বর্তমান বিশ্বে

লেখক পরিচিতি

Modern Astronomy বলতে যদি কিছু থাকে তার নাম হচ্ছে "মহা-ভাবনা"।

ধূম পিপাসা সর্বনাশা

১৯৮৯ সালে "ধূম পিপাসা সর্বনাশা" কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন কি উপায়ে ধুমপান করলে কোন ক্ষতি হয় না এবং কিভাবে ধুমপান ত্যাগ করা যায় তার একটি অব্যর্থ উপায় বলা হয়েছে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

পীর ধরার অকাট্য দলিল

"পীর ধরার অকাট্য দলিল" লিখে প্রমাণ করলেন আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্য পেতে হলে একজন খাঁটি পীর অবশ্যই ধরতে হবে। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করেছেন।

কয়েকটি কারামত

আল্লাহ্পাকের বড় বড় ওলীদের (কুতুব-উল-আকতাব) জীবনে মহান আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তেমনি কিছু সংখ্যক অলৌকিক ঘটনা বা কারামত এখানে প্রকাশ করা হল।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিচারপতি মোঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা অধ্যাপক জনাব সামসুল আলম সাহেব, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লিখা "কাসদুল সাবিল" নামক এলমে মা'রেফতের একটি কিতাব পড়তে দিয়েছিলেন। বিচারপতি সাহেবের ভাষায়- "কাসদুল সাবিল" কিতাবখানা পড়া অবস্থায় আমি একদিন মানিকগঞ্জের হুজুর কেবলার সহিত জামাতে আসর নামাজ পড়ার জন্য মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাই। আসরের নামাজ পড়ার পর আমি মোর্শেদ কেবলাকে সালাম প্রদান করি- 'আস্সালাম আলাইকুম'। সালামের জবাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "আসর নামাজের পূর্বে, আমার এখানে আসার সময় আপনি 'কাসদুল সাবিল' কিতাবখানা পড়ে এসেছেন।" আমি বললাম, "জ্বী হুজুর" এবং তাঁর 'এলমে কাশ্ফ' সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলাম।

* স্থান বয়রাঃ মোর্শেদ কেবলা মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বয়রা গ্রামে আব্দুল হালিম নামে একজন মুরিদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন "মাটির নীচ দিয়ে তো ইলিশ মাছের ঝাঁক দেখা যায়"। ঐ মুরিদ তখন কিছু বুঝতে পারলো না, বুঝার কথাও না। আল্লাহ্র ওলীদের কথা বুঝাটাও একটা কারামত। বয়রা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে পদ্মা নদী ছিল। কিছু দিনের মধ্যে এই সাড়ে পাঁচ মাইল জায়গা ভেঙ্গে ঐ মুরিদের বাড়ী সহ নদী হয়ে গেল। এখন সেই জায়গায় ইলিশ মাছের ঝাক দেখা যায়। জেলেরা অধিক সংখ্যক ইলিশ মাছ ধরার জন্য সেখানে যায়।

* স্থান ঃ সাটুরিয়া নন্দেশীতে - মোর্শেদ কেবলা একদিন আসরের নামাজ আদায় করতে দেরি হয়েছিল অর্থাৎ নামাজের সময় প্রায় শেষের দিকে। তখন সাথে কয়েকজন মুরিদ ছিল তাদেরকে তিনি বললেন "মসজিদের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেও আমি নামাজ আদায় করি"। মসজিদের ভিতরে মোর্শেদ কেবলা একাই নামাজ আদায় করছিলেন। দরজা জানালা বন্ধ করে মুরিদরা বাইরে বসা ছিল, একটু পরে আব্দুল কাদের মোল্লা (মোর্শেদ কেবলার খাদেম) ভাই ভাবলেন কোন জানালা খোলা আছে নাকি দেখে আসি, তিনি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখেন মোর্শেদ কেবলার জায়নামাজ মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে আছে এবং মোর্শেদ কেবলা শূন্যের উপরে নামাজ আদায় করছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। — চোখে দেখা সাক্ষী মোল্লা ভাই ও কয়েকজন মাওলানা সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* স্থান ঃ গোলাকান্দা – মোর্শেদ কেবলা রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সাথে মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত নামে দুই জন মুরিদ ছিলেন। তারাও ঘুমালেন। গভীর রাতে মাওলানা লাহরী সাহেব উঠে দেখলেন মোর্শেদ কেবলা বিছানায় নাই তখন তিনি ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা কি এস্তেঞ্জায় গেলেন, ভাল করে খুঁজে দেখলেন নেই। মসজিদেও নেই। এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাওলানা লাহরী ও শওকত সাহেব দেখলেন পশ্চিম পাশে পুকুরের মাঝখানে আকাশের উপর থেকে একটি উজ্জ্বল আলো এসে পরছে সেই আলোর মাঝখানে মোর্শেদ কেবলা জ য়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন! (আলহামদুলিল্লাহ্)। কিছুক্ষণ পর জায়নামাজ সহ মোর্শেদ কেবলা পানির উপর দিয়ে ভেসে পুকুরের কিনারের দিকে আসতে লাগলেন, উপর থেকে আলোটাও আসছিল। তখন মুরিদ দুইজন ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা যদি তাদেরকে দেখে রাগ করেন, এই ভেবে দুইজন এসে ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ্র ওলী বুঝতে পেরেছিলেন এরা দুইজন দেখে ফেলেছে, ঘরে এসে দুইজনকে বললেন "যা দেখেছো আমি জীবিত থাকা অবস্থায় কখনও কারো কাছে বলবে না"। –চোখে দেখা সাক্ষী মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* ১৯৯৪ সালে উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেব হজ্ব করতে

যাবেন, তখন তিনি কুতুব-উল-আকতাব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের (রহঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন। মোর্শেদ কেবলা প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন "মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের সময় আমার সালাম ও দরূদ শরীফ দয়াল নবীজীকে (সাঃ) পৌছায়ে দিয়েন।'' প্রিন্সিপাল সাহেব হজ্ব করতে গেলেন, তিনি হুজুর (সাঃ) এর রওজা শরীফে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা সালাম পাঠিয়েছিল একে একে সবার নাম বলে সালাম দিচ্ছিলেন যেই মাত্র প্রিন্সিপাল সাহেব দয়াল মোর্শেদ কেবলার নাম বলে সালাম দিলেন সাথে সাথে হুজুরপাক (সাঃ) এর রওজা শরীফ থেকে সালামের জবাব আসল "ওয়াকুল্লাহু মিননি সালাম'' অর্থাৎ আমার সালামও তাঁহার নিকট পৌছায়ে দিও'' (সুবহানআল্লাহ্)। এ তরীকার ইমাম কুতুব-উল-আকতাব গরীব-ই-নেওয়াজ হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর মত মানিকগঞ্জ পীর সাহেব হুজুর, দয়াল নবীজীর (সাঃ) পক্ষ থেকে সালামের জবাব পেলেন। —নিজ কানে শোনা ও চোখে দেখা সাক্ষী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়ালে

হুজুরপাক (সাঃ) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন তার কিছুদিন পূর্বে তাঁর আদরের নাতীদ্বয় হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) একই রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে পরেছিলেন। তখন তাদের সকল কাজের উৎস, প্রাণাধিক প্রিয় নানাজানের (সাঃ) নিকট এসে দুই ভাই বললেন, "নানাজান আমরা দুইভাই গতকাল রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি''। হুজুরপাক (সাঃ) বললেন নানাভাই কি দেখেছ আমাকে বল, তখন বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ) বললেন "আমি দেখলাম আমাদের চারিদিকে খুব বিপদ, প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না, দুই ভাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি, এমন সময় একটি বড় গাছ দেখে দুই ভাই ঐ গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেই, একটু পরে হঠাৎ জোরে বাতাস এসে গাছটিকে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।'' তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কনিষ্ঠ নাতী ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে বললেন "নানাভাই তুমি কি দেখেছ বল?" তিনি বললেন "নানাজান আমি হুবহু একই স্বপ্ন দেখেছি''। তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কলিজার টুকরা দুইভাইকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন "ভাইদ্বয় খুব শিঘ্রই তোমরা তোমাদের নানাভাইকে হারাবে, তোমাদের নানাভাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে'' এ কথা শুনে শিশু ভাইদ্বয় (রাঃ) গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তাই দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথা সর্বপ্রথম নাতী ভাইকে বলাটাও সুন্নত। হুজুরপাক (সাঃ) এর খাঁটি ওয়ারিস দয়াল মোর্শেদ কেবলা দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথাটি বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে সুন্নতস্বরূপ তাঁর আদরের নাতী- নাতনী ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি সারা জীবন অজস্র পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ৬৭ বছর বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। **সেদিন ছিল ২০০০ সালের ২১ শে মে রবিবার দিবাগত রাত্রি অর্থাৎ সোমবার,** মোর্শেদ কেবলা কন্যাদেরকে বললেন আমাকে ভাল করে গোসল করিয়ে দাও। সবাই তাঁকে গোসল করিয়ে দিলেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুব অল্প আহার করতেন। কিন্তু সেদিন বললেন, "আমাকে খাবার দাও আমি আজকে খাব"। তিনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেন, তারপর এস্তেঞ্জা সেরে ওজু করে বিছানায় শুতেই শরীর খুব খারাপ লাগছিল। বিছানায় শুয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে "পাছ আন ফাছ" সবক (নিঃশ্বাস নিতে আল্লাহ্- ছাড়তে হু) করছিলেন। কিছুক্ষণ সবক করতে করতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের নয়নমনি, কুতুব-উল-আকতাব, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হুজুরপাক (সাঃ) এর এই খাঁটি ওয়ারিস সকলের বুক খালি করে দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়াল হয়ে গেলেন।

মোর্শেদ কেবলার মহা-মূল্যবান কয়েকটি বাণী

- জীবনের প্রথম শাখে যে কোকিল প্রথম ডাকে, হোক সে কুৎসিত কালো, তবু জীবনের আলো।
- প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কথা বলেছেন, যুদ্ধের সময় কোন কথা বলতেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে ঘাড়ে করে পানি আনতে বলেছেন। সব কথা আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায়।
- হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন "বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাত্র ৭০ হাজার খাঁটি ঈমানদার থাকবে" তুমি বসে বসে ভাব তুমি এ পরীক্ষায় টেকো কিনা।
- বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্''-র ধ্বনীতে প্রতিধ্বনীত হবে।
- একটি কথা তিনি, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের সামনে প্রায়ই বলতেন তা'হলো "আমাকে যদি কেউ কখনো পান খাওয়ার সময় ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে চুন খেতে দেখেন এবং কোন সুন্নত এমনকি একটি মোস্তাহাবেরও খেলাপ করতে দেখেন, তাহলে আমার মুরিদ হয়ে যদি আমাকে সংশোধন করে না দেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত ঠেকা (দাবি) থাকবেন।
- মূর্খ্য লোকের ঈমান কচু পাতার পানি।
- উঠ, জাগ, অভিষ্ঠ সিদ্ধির আগে ক্ষান্ত হইও না।
- আমার একটা অনুরোধ, হাদীস শরীফে যা আছে যেমন আছে এবং কোরআন শরীফে যা আছে যেমন আছে তেমনভাবেই জীবন চালাতে হবে। এর বাইরে আমার ধারে (নিকট) যে বয়াত (মুরিদ) হইয়া থাকেন কোন বুদ্ধি খাটাইতে পারবেন না, যদি

খাটান আমি তার পীর না, সে আমার মুরিদ না।

- মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ক্রমাগতভাবে এমন উন্নতি করছে যে, এরপর মানুষ আর মানুষ থাকবে না, খালি জ্ঞানই হবে। যদি কেউ হেটে যায় মানুষ বলবে একটা জ্ঞান হেটে যায়, এত জ্ঞানী মানুষ হবে এরকম হতে হতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করবে (নাউজুবিল্লাহ্), করতে করতে আবার খুব যদি জ্ঞানী হয় তখন সে ফিরে আবার আল্লাহ্পাকের কুদরতী পায়ে পরে কান্দা শুরু করবে (আলহামদুলিল্লাহ্)।
- কোন শব্দ শুরু হলে সেটা কোথাও যেয়ে শেষ হয় না, যেতেই থাকে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেয়েও শেষ হয় না, এভাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়, যেতে যেতে আল্লাহ্পাক পর্যন্ত যায়।
- ঘর যেমন মানুষকে আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, মানুষের মনের ঘরও তাকে আল্লাহ্ থেকে (অনন্ত থেকে) বিচ্ছিন্ন করে রাখে।
- তুমি দেখিতেছ পাহাড়গুলি স্থির হইয়া রহিয়াছে। অথচ উহা মেঘের ন্যায় চলাফেরা করিতেছে।
- বান্দার চোখের পানির সঙ্গে এবং জেকেরের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের একটা দারুন রকমের সম্পর্ক আছে।
- তোমার দুর্বল ঈমানের সঙ্গে একটা সবল ঈমানের যোগ কর।
- একটা মানুষের কাছে না গেলে মানুষ মানুষ হয়না।
- এলেমের যখন মৃত্যু হয়, আলেম তখন আলেম হয়।
- জগৎ জোড়া একই মোর্শেদ চিনে কয়জনা, মোর্শেদের মরণ হয় না কোন কালে।
- দেখলে তাঁরে দেখার মত, সাধনা কি লাগত এত? ভাবলে তাঁরে ভাবার মত, ভাবনা রইত না আর।

বিঃ দ্রঃ এখানে খুব সংক্ষেপে এ মহান আল্লাহ্র অলীর পরিচিতি প্রকাশ করা হলো। সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোর্শেদ কেবলার সম্পূর্ন জীবনী বের হতে যাচ্ছে।

১ম অধ্যায়

মহাসৃষ্টির তুলনায় মানুষ কতটুকু?

এ বিশ্বে মানুষই একমাত্র তার স্রষ্টাকে নিয়ে যত দুর্বোধ্য ভাবনা ভাবে। তাহলে প্রথমেই মানুষ কতটুকু, তার ভাবনাশক্তি কতটুকু, মানুষের আসল পরিচয় কি এবং তার ভাবনার সত্ত্বা মহাস্রষ্টার পরিচয় কি, তা অন্তত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য জানা দরকার।

মানুষ ছোট হোক বা বড় হোক, মহাজ্ঞানী হোক বা ক্ষুদ্র জ্ঞানী হোক, সে নিজেকে যা ভাবে বা নিজেকে যতটুকু যোগ্য মনে করে, সেকি আসলে তা-ই! মানুষের জ্ঞানের দৌঁড় এবং যোগ্যতার সীমার পরিমাপ জানতে হলে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হয়। মহাবিশ্ব নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের কোন অস্তিত্বই নেই। তাই প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে মহাবিশ্বের একটি আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানের মতে আমাদের মাটির পৃথিবীর পরিধি বা বেড় হচ্ছে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) মাইল। এর ব্যাস ৮,০০০ (আট হাজার) মাইল এবং ওজন হচ্ছে ছয় এর পরে একুশটি শূন্য বসালে যা হয় তাই অর্থাৎ ৬×১০^{২১} বা ৬,০০০০০০০,০০০০০০০,০০০০০০০ ('ছ' কোটি কোটি কোটি) টন। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এর ব্যাস আট লক্ষ ছে'ষট্টি হাজার মাইল এবং এর ওজন পৃথিবীর ওজনের চেয়ে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ বেশী, সূর্যের চারদিকে রয়েছে ন'টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। সূর্য তার ন'টি গ্রহ ও ৪৪টি উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগত গঠন করেছে।

সৌরজগতটি আবার একটি মহাজগতের ভেতর রয়েছে। এই মহাজগতটির নাম হচ্ছে ছায়াপথ (Milky Way)।

তারাভরা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মেঘমালার ন্যায় কুয়াশাচ্ছন্ন একটা পথের মত দেখা যায়। একেই ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে বলা হয়। ঐ যে মেঘের মত বা কুয়াশার মত দেখা যায়, ওগুলো আসলে মেঘ বা কুয়াশা নয়, ওগুলো হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্রের বিপুল সমাবেশ। কল্পনাতীত দূরত্বে রয়েছে বলে ঐ সব নক্ষত্রগুলোকে মেঘের মত মনে হয়। এই ছায়াপথটিকে একটি বিশ্ব বলা হয়েছে। এই বিশ্বটি এতই বিশাল যে কল্পনা করতেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।

প্রায় ১০×১০^{১১} বা ১০,০০০,০০,০০,০০০ দশ হাজার কোটি নক্ষত্র দিয়ে এই বিশাল ছায়াপথ বিশ্বটি গঠিত। এ ছায়াপথটি এতই বিশাল যে, এর একপাশ থেকে অন্য পাশের দূরত্ব হচ্ছে ৯,৭৫,০০০ (ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) আলোক বছর। আলোক বছর কাকে বলে? মহাবিশ্বের বিশাল দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য একক হিসাবে আলোক বছর বা আলোক বর্ষ বা লাইট ইয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আলো এক সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল পথ অতিক্রম করে। সহজ কথায়, এক বলতে এক সেকেন্ডে সময় লাগে, এই এক বলতে যে সময়টুকু লাগে, তাতে আলো এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে। এই গতিতে আলো এক বছরে পাঁচ লক্ষ অষ্টয়াশি হাজার কোটি মাইল রাস্তা অতিক্রম করে। আলো এক বছরে যত মাইল রাস্তা অতিক্রম করে তাকে আলোক বছর (Light Year) বলা হয়। ছায়াপথের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছতে সময় লাগে ৯,৭৫,০০০ (ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) আলোক বছর। অর্থাৎ ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব হচ্ছে সাতান্ন হাজার তিনশো ত্রিশ কোটি কোটি মাইল, অংকে সংখ্যাটি কি রকম বিরাট দাঁড়ায় ঃ ৫৭,৩,৩০,০০০০০০০,০০০০০০০ বা ৫৭.৩৩×১০^{১৭}।

এই ছায়াপথটিকে একটি বিরাট বিশ্ব বলা হয়েছে। সূর্য তার গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে এই বিশাল ছায়াপথের ভেতরে আছে। সূর্য এই ছায়াপথের কেন্দ্র হতে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোক বছর দূরে রয়েছে। এই ছায়াপথটিকে আমাদের প্রতিবেশী বিশ্ব বলা হয়।

ছায়াপথ বিশ্বের বিশালতা

প্রায় দশ হাজার কোটি, কোন কোন বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বিশ হাজার কোটি নক্ষত্র দিয়ে ছায়াপথটি গঠিত। ছায়াপথটির ভেতরে এত বড় বড় তারা রয়েছে যে, তাদের বিশালতার কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়।

আমাদের মাটির পৃথিবীর পরিধি বা বেড় হচ্ছে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) মাইল এবং ব্যাস হচ্ছে আট হাজার মাইল। সূর্য মাটির পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। একশো ত্রিশটি পৃথিবী পাশাপাশি জোড়া দিলে সূর্যের এক পাশ থেকে অপর পাশে পাড়ি দেয়া যায়। সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড় নক্ষত্র ছায়াপথে রয়েছে। বেটেলজিওস বা আর্দ্রা নামে একটি নক্ষত্র রয়েছে যেটি আমাদের পৃথিবী থেকে একশো নব্বই আলোক বছর দূরে অবস্থিত এবং এর ব্যাস হচ্ছে ২১×১০^{৭} বা ২১,০০,০০,০০০ (একুশ কোটি) মাইল। কয়েক কোটি সূর্য এর ভিতরে পুরে রাখা যায়। অমিক্রনসিটি (Omicroncity) নামে একটি অতিকায় দানব নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার ভিতরে ৩,০০,০০,০০০ বা ৩×১০^{৭} (তিন কোটি) সূর্যকে ঢুকিয়ে রাখা যায়। বৃশ্চিক রাশিতে জ্যেষ্ঠা (Antares) নামে আর একটি অতিকায় উজ্জ্বলতর লাল নক্ষত্র আছে, যার দূরত্ব আমাদের মাটির পৃথিবী হতে ১২৫,০০,০০,০০০ বা ১২.৫×১০^{৮} (একশো পঁচিশ কোটি) আলোক বছর এবং তার ব্যাস ৩৯,০০,০০,০০০ বা ৩৯×১০^{৭} (উনচল্লিশ কোটি) মাইল। এটি সূর্যের চেয়ে ১০,০০,০০,০০০ বা ১০×১০^{৮} (দশ কোটি) গুণ বড় অর্থাৎ দশ কোটি সূর্যকে এর ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। সূর্যের স্থানে যদি আন্টারিসকে স্থাপন করা যেত তাহলে পৃথিবীশুদ্ধ আমরা আন্টারিসের ভেতর ঢুকে যেতাম। অরিগা তারামন্ডলে একটি অতি বিশালাকায় তারা আছে, যার খবর জেনে বিজ্ঞানীরা হতবাক হয়ে গেছেন। এই তারামন্ডলে একটি তারা আছে যেটা সূর্যের চেয়ে সাতাশশো কোটি গুণ বড় অর্থাৎ ২,৭০০,০০,০০,০০০ বা ২৭×১০^{৯} (দু'হাজার সাতশ') কোটি সূর্যকে এই তারার ভিতরে অনায়াসে ঢুকিয়ে রাখা যায়। আমাদের ছায়াপথ হতে দূরে দু'খন্ড নক্ষত্র মেঘ দক্ষিণ আকাশে মেরু প্রদেশে আছে। এরা ম্যাগিলন নামে পরিচিত। এর বড় মেঘটিতে এস ডোরাডাস (S.Doradas) নামে একটি নক্ষত্র আছে। এটাই বিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা বলে মনে করা হয়। এটি সূর্যের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল। বলা বাহুল্য, সূর্যের গায়ে প্রায় দু'কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা আছে। এস ডোরাডাস নক্ষত্রের কাছাকাছি কোনভাবে সূর্যকে নিয়ে যদি হাজির করা যায়, তবে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকতে সূর্য ডোরাডাসের ভীষণ তেজে জ্বলে বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই নক্ষত্রটির ভেতরে যে মহাঅগ্নি এবং তেজ আছে, তা যদি কোন ক্রমে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত, তবে সমগ্র বিশ্ব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

ছায়াপথ বিশ্বটির ভেতরে সূর্যের সমান, তার চেয়ে কিছু বড়, অনেক বড় বড় অজস্র নক্ষত্র রয়েছে। মহাবিশ্বে ছায়াপথের মত অজস্র বিশ্ব রয়েছে। এ্যান্ড্রোমিডা বলে একটি নীহারিকা বা বিশ্বের খবর পাওয়া গেছে যেটি প্রায় ছায়াপথের মতই বিশালাকায় একটি বিশ্ব। ছায়াপথ থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে বিশ লক্ষ আলোক বছর। এতে রয়েছে প্রায় ১০,০০০,০০,০০,০০০ বা ১০×১০^{১১} (দশ হাজার কোটি) নক্ষত্র। এসব নক্ষত্র তারকা কোন কোনটা সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়, কোন কোনটি অনেক কোটি গুণ বড় এবং আলো ও উজ্জ্বল্যে সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। কোন কোনটি পৃথিবীর মত ছোট বা সূর্যের চেয়ে ছোট। এ্যান্ড্রোমিডা বিশ্বের এক পাশ থেকে অন্য পাশের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ আলোক বছর।

আরও মহাবিস্ময়!

বস্তুর একক আয়তনের ভরকে ঘনত্ব বলে। ধরে নেয়া যাক, একটি পাত্রের দৈর্ঘ্য এক ফুট, প্রস্থ এক ফুট এবং উচ্চতা এক ফুট। এরূপ একটি পাত্রকে একক আয়তন ধরে নিয়ে, তার ভেতরে পানি পূর্ণ করে ওজন নিলে যে ওজন আসবে, পানির পরিবর্তে পাত্রটিকে লোহা দ্বারা পূর্ণ করলে ওজন হবে ঐ পানির ওজনের চেয়ে সাড়ে সাত গুণ বেশী অর্থাৎ লোহার ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে সাড়ে সাত গুণ বেশী। হীরক লোহার চেয়ে অনেক বেশী ওজন এবং ঘনত্বের জি নিষ। এর ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে দশগুণ বেশী। লুব্ধক নক্ষত্রের একটি ছোট সঙ্গী নক্ষত্র

আছে, যেটি পৃথিবীর চেয়ে পরিমাণে একটু বড় কিন্তু ভেতরে এত বস্তুপুঞ্জ ঠাসাঠাসি করে জমাট হয়েছে যে এর পরিমাণ প্রায় সূর্যের ভেতরের বস্তুপুঞ্জের সমান। এর ফলে বস্তুপুঞ্জের ঘনত্ব এত অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে গেছে যে পানির ঘনত্বের চেয়ে এর বস্তুপুঞ্জের ঘনত্ব ষাট হাজার গুণ বেশী হয়েছে। এই নক্ষত্রের বস্তুপুঞ্জ হতে এক দিয়াশলাই পরিমাণ বস্তু উত্তোলন করতে প্রায় পঁচিশ জন জোয়ান লোক লাগবে। এর চেয়েও আর একটি মহাওজনের নক্ষত্রের খবর মিলেছে, এই নক্ষত্রের নাম ভ্যানম্যানেনস (Van Mannens) । এর আকার পৃথিবীর আকারের চেয়ে সামান্য একটু ছোট। এর ভিতরের এত বস্তুপুঞ্জ ঠাসাঠাসি করে জমাট হয়ে এর ঘনত্ব এত বেশী হয়েছে যে কল্পনা করতেও দম রুদ্ধ হয়ে আসে। এই নক্ষত্রের বস্তুপুঞ্জের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে চার লক্ষ গুণ বেশী। এর থেকে এক দিয়াশলাই পরিমাণ বস্তুপুঞ্জ উত্তোলন করতে প্রায় একশো পঁচাত্তর জন জোয়ান লোক লাগবে। এই ভাবে মহাবিশ্বে কতই না অত্যাশ্চর্য বস্তুর সমাবেশ ও তার লীলাখেলা চলছে! নিউট্রন তারা নামে আর একটি তারা যেটি সাদা বামন তারার অন্তস্ফূরোন বা ধ্বসে পড়ার পর সৃষ্টি হয়, সেটির ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে ১০০,০০,০০০,০০,০০,০০০ বা ১০×১০^{১৪} এক কোটি কোটি গুণ বেশী অর্থাৎ এর ঘনত্ব ১০১৪ গ্রাম./সি. সি. । সহজ কথায় এর থেকে পূর্ববৎ এক দিয়াশলাই পরিমাণ বস্তুপুঞ্জ উঠাতে প্রায় চার হাজার তিনশো পঁচাত্তর কোটি জন জোয়ান লোক লাগবে।

কালো গহ্বর (Black Hole) নামে মহাশূন্যে একটি ভয়াবহ এবং অন্ধকারতম জায়গা আছে। সেটি যে বস্তুপুঞ্জ দ্বারা তৈরি তা নিউট্রন তারার বস্তুপুঞ্জের চেয়ে কতগুণ যে বেশী, তা আজও বৈজ্ঞানিকগণ সঠিক করে নির্ণয় করতে পারেননি। এর আকর্ষণ ক্ষমতা এত বেশী যে, কোন নক্ষত্র তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করা তো দূরের কথা আলোও তার ছোবল থেকে রেহাই পায় না, আলোকেও সে চুষে নেয়। কোন নক্ষত্র যদি তার আকর্ষণ ব্যাসার্ধের মধ্যে আসে তাহলে কালো গহ্বরের আকর্ষণে নক্ষত্রটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ কালো গহ্বরের ভিতরের দিকে অগ্রসর হয় এবং নিমিষেই কালো গহ্বর তা গ্রাস করে ফেলে।

আরো একটি আশ্চর্য আবিষ্কার

সম্প্রতি আমাদের মাটির পৃথিবী থেকে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আলোক বছর দূরে সেন্ট্রাস-এ নামে একটি বিশ্ব আবিষ্কার করা হয়েছে। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ত্রিশ লাখ আলোক বছর অর্থাৎ এর আয়তন আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের আয়তনের চেয়ে তিন গুণেরও বেশী। খালি চোখে দেখা গেলে সেন্ট্রাস এ কে চন্দ্রের আকারের চেয়েও ২০ গুণ বড় দেখাত। বিশ্বটির কেন্দ্রে একটি আজগুবি কান্ড দৃশ্যমান হয়। দমকল যেমন তার হোস পাইপের মধ্য দিয়ে বিপুল বেগে পানির ফোয়ারা ছুঁড়ে দেয়, তেমনই সেন্ট্রাস-এ এর ইঞ্জিন কেন্দ্র থেকে অত্যন্ত উচ্চশক্তিসম্পন্ন আয়নিত গ্যাস নিক্ষেপ করছে। বৈজ্ঞানিকগণ এর নাম দিয়েছেন কসমিক জেট। বিশ্বটির ভর সূর্যের ভরের চেয়ে ত্রিশ হাজার কোটি গুণ বেশী। অংকে সংখ্যাটি কি বিরাট দাঁড়ায়। সংখ্যাটি হচ্ছে ৫.৯৪×১০^{৩৮} বা ৫৯৪০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, অর্থাৎ পাঁচ হাজার নয়শো চল্লিশ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি টন। সেন্ট্রাস-এ হতে প্রচন্ড তড়িৎ চুম্বক বিকিরণ হচ্ছে। যাতে আছে গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, দৃশ্যমান রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি, এবং রেডিও তরঙ্গ বা রেডিও রশ্মি। কিন্তু এই রশ্মিগুলোর মাত্রা বা তীব্রতা সাধারণ রশ্মি বা রেডিও রশ্মির চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। এটি বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে। বিশ্বটিতে রয়েছে সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় বহু নক্ষত্র। কিন্তু এর কেন্দ্রে কালো গহ্বর আছে, যা ইঞ্জিনটির জ্বালানি যোগান দেয় বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন।

ইদানিং আকাশবিজ্ঞানীরা একটা নতুন তথ্য বের করে ভাবনায় বিভোর হয়েছেন। একটা নতুন নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এটাকে একটা বিশ্ব বলা হয়েছে। প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে এর ভিতরে। বেটেলজিওস, আন্টারিস যা সূর্যের চেয়ে আট কোটি, দশ কোটি গুণ, এরকম নক্ষত্রও রয়েছে কয়েক কোটি। সূর্যের চেয়ে সাতাশশো কোটিগুণ বড় নক্ষত্রও এটাতে আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই নীহারিকা বিশ্বটি মাটির পৃথিবী থেকে প্রায় আঠার শ' কোটি আলোক বছর দূরে আছে। কত বিস্ময়কর এই মহাবিশ্ব!!

মহাপ্রচন্ড গতি

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌছতে প্রায় তিন/চার হাজার কোটি আলোক বছর সময় লাগে। মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্র প্রচন্ড গতিতে ছুটে চলেছে এবং মহাবিশ্বের মহাপ্রচন্ড গতির সাথে তাল মিলিয়ে মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একই দিকে ছুটে চলেছে। কোন কোন নক্ষত্র প্রতি সেকেন্ডে চব্বিশ/পঁচিশ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা আরও অসংখ্য নীহারিকা বিশ্বের সন্ধান পেয়েছেন, যারা মহাপ্রচন্ড বেগে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। কোন কোন নীহারিকা বিশ্ব প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি এবং তার গতিবেগ আবিষ্কার করে হাব্‌ল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। সেটি হচ্ছে, কোয়াসারের (Quasar) লোহিত অপসারণ বেগ যা প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার চারশো মাইল অর্থাৎ এর গতি আলোর গতির কাছাকাছি।

বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ বলেছেন, প্রায় এক হাজার কোটি বছর যাবৎ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন মহাবিশ্ব প্রায় পাঁচশো কোটি বছর যাবৎ সৃষ্টি হয়েছে। এখন মোটামুটি হিসেব করে দেখা যাক, এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার চারশো মাইল প্রতি সেকেন্ডে যার চলার গতি হয়, পাঁচশো কোটি বছরে সে কত মাইল রাস্তা অতিক্রম করে? এভাবে একহাজার কোটি বছরেই বা কত মাইল রাস্তা সে অতিক্রম করে!

একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা যা মহাবিশ্বে মহাসৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি ঘটে চলেছে। সে

হচ্ছে মহাবিশ্বের কোটি কোটি নীহারিকা বিশ্ব, যার প্রত্যেকটার ভেতর প্রায় দশ হাজার থেকে বিশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। সৃষ্টির পর থেকেই এরা মহাপ্রচন্ড গতিতে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে বিরামহীনভাবে ছুটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা ভেবে হতবাক হয়ে বলেন, মহাবিশ্ব এইসব কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে একদিকে শুধু ছুটেই চলেছে। আর কোন দিন ফিরে আসেনি।

সৃষ্টির পর থেকে ছুটে চলতে চলতে কত কোটি কোটি মাইল রাস্তা পার হয়ে গেছে এবং এরা কবে কোথায় কোন্ সীমানায় গিয়ে পৌছবে এবং মহাকাশের মহাশূন্যতায় কোনদিন পাড়ি জমাতে পারবে কি না আজও কোন বিজ্ঞানী সঠিক করে বলতে পারেননি। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন, প্রতিটি নীহারিকা বিশ্বের মধ্যে যেমন একটি মহাকর্ষের টান (Gravitation) অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে একটি মহাবিকর্ষের ঠেলা (Cosmic Repulsion) অর্থাৎ প্রসারিত হওয়ার প্রভাবও রয়েছে। এভাবে আইনষ্টাইনের মতে মহাবিশ্ব শুধু একদিকে ছুটেই চলছে না, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সে প্রসারিতও হচ্ছে।

এবার ভাবতেও মাথা ঝিম ধরে আসে যে, মহাকাশের অনন্ত শূন্যতা যে কত বড় ও কতই বিশাল এবং সীমাহীন তার পরিসর তা কিছুতেই কল্পনায় আনা যায় না। অনন্ত আকাশের বুকে এইসব নীহারিকা বিশ্বরা এবং তাদের গ্রহ-নক্ষত্র নিশীথ রাতের গৃহত্যাগী দরবেশের মত। যারা সংসার বিরাগী হয়ে ঘর থেকে এই যে বেরিয়ে যায় সমস্ত মোহমায়া পরিত্যাগ করে, কোনদিন আর ঘরে ফিরে আসে না, আমরণ বন থেকে বনান্তরে অজানা উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে ঘুরে বেড়ায়। আরও একটি কথা এই যে, এইসব মহানীহারিকা বিশ্বরা আয়তনে এত অতিকায় থাকা সত্তেও একটির সাথে আর একটি ঘিঞ্চি হয়ে অবস্থান করছে না। একটা থেকে অন্য একটি নীহারিকা বিশ্ব কোন কোন ক্ষেত্রে দু'শ' থেকে আড়াই শ' কোটি আলোক বছর দূরে অবস্থান করছে।

একটি উদাহরণ দিলে মহাশূন্যে নীহারিকা বিশ্ব গুলোর অবস্থান সম্বন্ধে কিছু আঁচ করা যাবে। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর। এই মহাসাগরটি প্রায় সাড়ে বার হাজার মাইল লম্বা, সাড়ে চার হাজার মাইল চওড়া এবং আট মাইল গভীর। এই মহাসাগরের দৈর্ঘ্যের দু'প্রান্তে দু'টো নৌকা রাখলে যে দূরত্বে অবস্থান করে, এই মহাশূন্য সাগরের বুকে নীহারিকা বা ছায়াপথগুলো ঐ নৌকার মত দূরত্বে অবস্থান করছে। এবার কল্পনা করে দেখুন, দশহাজার কোটি মতান্তরে বিশ হাজার কোটি নীহারিকা বিশ্ব, আর প্রত্যেকটি বিশ্বে রয়েছে আবার দশ হাজার কোটি অতিকায় নক্ষত্র, তারা অনন্ত মহাশূন্য সাগরে অতি নগণ্য জায়গা দখল করে অবস্থান করছে। মহাশূন্যে কত সীমাহীন জায়গা খালি পড়ে আছে।

আগেই বলা হয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাসাগর। এই

মহাসাগরটি বিশাল পানির মহাসমারোহে ভরে আছে। এই মহাসাগরের একপ্রান্তে একটা টিকটিকির ডিমের খোসাকে নৌকা মনে করে ভাসিয়ে দিলে এই মহা জলধির বুকে কতটুকু জায়গা জুড়ে ভাসতে থাকে? সমগ্র মহাসাগরের বিপুল আয়তন পানির তুলনায় এই ডিমের খোসাটি কতটুকু! একেবারেই নগণ্য।

মহাস্রষ্টার মহাশূন্যাকাশে যে মহাশূন্য জায়গা খালি পরে আছে, সেই শূন্য জায়গাকে যদি প্রশান্ত মহাসাগর মনে করা হয়, তবে সেখানে রয়েছে দশ হাজার কোটিরও বেশী মহাবিশ্ব, যার প্রতিটি বিশ্বে রয়েছে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র, যার কোন কোনটি নক্ষত্র সূর্যের চেয়েও দু'হাজার সাতশো কোটি গুণ বড়। এই **বিশ্বগুলো গ্রহ-নক্ষত্রসহ একত্র করে মহাশূন্যের অনন্ত খালি সাগরে ভাসিয়ে দিলে, একটা টিকটিকির ডিমের খোসার মত সেই অনন্ত শূন্য সাগরের এক কিনারায় ভাসতে থাকবে, আর বাকী সমস্ত জায়গাই খালি পড়ে থাকবে। মহাশূন্যে সাগরের একপ্রান্ত থেকে নজর করে সমগ্র মহাবিশ্বকে একত্রে অনন্ত শূন্য জায়গার তুলনায় এতই ছোট এবং নগণ্য বলে মনে হয় যে, এর অস্তিত্ব কোন রকমে অনুমান করা যায়।** আবার দশ হাজার কোটি নক্ষত্রভরা এক একটি নীহারিকা বিশ্ব থেকে নজর করলে অন্য একটি বিশ্বকে এতই ক্ষুদ্র মনে হয় যে, তার অস্তিত্ব কোন করমে ধরা পড়ে। আমাদের প্রতিবেশী বিশ্ব অর্থাৎ ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে দৃষ্টিপাত করলে সূর্যকে একটা সূঁচের মাথা পুড়িয়ে লাল করলে যেমন দেখা যায়, তেমন একটা সূক্ষ্ম আলোর বিন্দুর মত মনে হয়। ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে তাকালে সূর্যের কোন অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ কতটুকু মহাবিস্ময়!

এই মহাবিশ্বের এবং মহাশূন্যকাশের বিশালতার তুলনায় মানুষ কতটুকু? মহাশূন্যের তুলনায় মহাবিশ্ব কতটুকু জায়গা দখল করে আছে? মহাবিশ্বের তুলনায় দুনিয়ার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় সূর্যের কোন অস্তিত্বই নেই। সূর্যের তুলনায় তের লক্ষ গুণ ছোট পৃথিবী কতটুকু? এই একেবারেই নাই-র মত পৃথিবীর মধ্যে আবার কয়টি মহাদেশ, একটি মহাদেশে আবার কয়েকটি ক্ষুদে দেশ, তার মধ্যে আবার চীন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত। আবার ভারতবর্ষেরই অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বিভাগ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ইত্যাদি। এই বিভাগের আবার ক্ষুদ্র একটা শহর এই শহরে একটা বাড়ী, তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ঘর, তার মধ্যে একটা ক্ষুদে জীব মানুষ। এই মানুষের আরও ক্ষুদ্র একটা পিটপিটে মাথা, যে মাথাও আবার ভাবনায় চিন্তায় ইন্দ্রিয় চালনায় কতইনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। সেই মাথার এক কোণে একটুখানি মগজ, সেই মগজের এক অন্ধকার কোণে চিন্তাশক্তির সূক্ষ্মতম একটি কেন্দ্র, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন অনুমানই করা যায় না এবং দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা বলেছেন, "এই চিন্তাশক্তি কোথা থেকে যে আসে আমরা তা বলতে পারি না।" **সেই অতি ক্ষুদে চিন্তাশক্তি প্রাণপণ বেগে খাটিয়ে, মানুষ যুক্তি করে মহাসৃষ্টির মহাস্রষ্টার বিপক্ষে যুক্তি**

খাটিয়ে রায় দিয়ে বলে, স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই টেই। কত উদ্ভট বল্গাহারা বিবেচনাহীন মন্তব্য এই কুটিল মানুষের!!

তাই তো কবিতার ভাষায় ঃ

গভীর নিশীথে কে যেন ডাকিছে অনন্তের পথ হতে,
বিশালতা মাঝে হারিয়েছ কভু? থেকো না দাঁড়িয়ে পথে।
আপনারে এত জড়ায়ে রেখে, আপন হারিয়ে গেলে,
সংকীর্ণতায় আপনারে বেঁধে, কত ধন গেলে ফেলে।
এত কাছাকাছি কার কাছে র'লে, যে ছিল আপনজন,
একবার জেগে দেখিলে না তারে, এত ছোট ছিল মন!
হারায়ে দেখ অনন্তের পথে, আপনারে ফিরে পাবে,
জীবন-প্রদীপ নিভে গেল, বল, কার কাছে ফিরে যাবে।

কে সেই মহা পরাক্রমশালী?

অনন্ত মহাশূন্য সাগরে মহাবিশ্বের দশ হাজার কোটি মহাবিশ্ব একত্র করে, একত্রে একটি ডিমের খোসার মত অনন্ত শূন্য সাগরের এক কোণায় ভেসে আছে। বাকী সমস্ত সাগরটাই শূন্য পড়ে আছে। এই মহাবিশ্ব এবং অনন্ত শূন্য জায়গা বিশ্বের কেউ সৃষ্টি করেছে বলে কেউ দাবি করে না। কেউ বলে না এই মহাবিশ্ব, আমার সম্পত্তি এবং এর উপর আমার একচ্ছত্র আধিপত্য এবং আমিই বা আমরা এই মহাবিশ্ব, অনন্ত শূন্য জায়গা সৃষ্টি করেছি। একমাত্র এক পরাক্রমশালী মহাশক্তি আছেন যিনি দাবি করে বলেছেন, *"আল্লাযী লাহু মুলকুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ"* (আল-কুর'আন)। এ মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছি আমি এবং এর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা আমার। তিনি আরও দাবি করে বলেছেন, *'লিল্লাহি মাফিছ ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ"* (আল-কুর'আন)। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে (দৃশ্য-অদৃশ্য) সবই আমার (আর কারও নয়)। তিনি আরও বলেছেন, *"ওয়াছিয়া কুরছিয়্যুহুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ"* (আল্-কুর'আন)। একেবারে শেষে তিনি বলেছেন, অনন্ত শূন্যতা এবং দশ হাজার কোটি মহাবিশ্ব আমার কুরছির (বসার আসনের) নীচে চারটি পায়ার আবেষ্টনির ভেতরে আছে এবং আমার কুরছিটি (আসনটি) অসীম শূন্যতায় এবং মহাবিশ্বের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এসব কিছুর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁর মোটেই বেগ পেতে হয় না। তাই তিনি আরও বলেছেন, *"ওয়ালা ইয়া উদুহু হিযাজুহুমা ওয়া হুয়াল আ'লীউল আজীম"* (আল্ কুর'আন)- এই মহাসৃষ্টি হেফাজত করতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয় না অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনি উচ্চ, সুমহান এবং সবার উপরে বড় ও সর্বশক্তিমান।

২য় অধ্যায়

ভাববার কথা

মহাবিশ্বের মহাসৃষ্টির যে মহালীলা অবিরাম ঘটে চলেছে, তাতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক অনেক ভাববার কথা রয়েছে। জ্ঞানকে জ্ঞান করার জ্ঞান অনেকেরই থাকে না, যদিও পাশের জ্ঞান অনেক থাকে।

দর্শন শাস্ত্র হচ্ছে সবার উপরে জ্ঞানের শাস্ত্র। দর্শনের মতে, কোন বস্তু বা সৃষ্টি দেখলেই একটা কথা অবশ্যই ধরে নিতে হবে এবং তা হচ্ছে, যে কোন সৃষ্টি, সৃষ্টি হওয়ার পেছনে অবশ্যই একটা পরিকল্পনা আছে। যেমন- একটা ঘর বা একটা ছবি, একটা সেতু, একটা ফুটবল, একটা টেবিল বা আলমারী দেখলেই বুঝা যায় এর পেছনে একটা পরিকল্পনা (Plan) আগে করা হয়েছে, পরে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্তুটি সৃষ্টি করা হয়েছে। দর্শনের মতে, যখনই কোন বস্তুর সৃষ্টির পেছনে একটা পরিকল্পনা আছে বোঝা যায়, তখনই স্বভাবতই ঐ পরিকল্পনা করার জন্য একজন পরিকল্পনাকারী নিশ্চয়ই আছেন বোঝা যাবে। দর্শন আরও বলে, কারণ বিহীন ঘটনা ঘটে না ("Exnihilo nil fit, Sinequa non")।

মহাবিশ্বের এই যে, কোটি কোটি নক্ষত্র, তারকা, ছায়াপথ, নীহারিকা, এদেরকে গভীরভাবে অবলোকন করলে, প্রত্যেকটি তারা, নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ, কোয়াসার, পালসার সৃষ্টির পেছনে একটা অত্যন্ত উচ্চমানের সুনিপুণ পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়। ছায়াপথ, নীহারিকাগুলোকে মহাশূন্যে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে তাদের মাঝে দূরত্ব এবং ব্যবধানটা এমন সুনিপুণভাবে করা হয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট পরিক্রমণ পথ শূন্যের মাঝে এমন সুন্দরভাবে ছক কেটে দেয়া হয়েছে যে, একটার সাথে আর একটার কোন দিনই ঠোকাঠুকি হচ্ছে না।

আগেই বলা হয়েছে সমগ্র মহাবিশ্ব এক অতি প্রচন্ড গতিতে অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলছে। এই অনন্তের পথে কোটি কোটি বছর ছুটে চলতে চলতে কেউ কারো গা ঘেষা হয়ে পড়ছে না। হঠাৎ যদি চলার পথে একটা নীহারিকা বিশ্ব অন্য একটা নীহারিকা বিশ্বের কাছাকাছি হয়ে যেত বা একটি তারকা আর একটি তারকার সঙ্গে ঠেকে যেত, তাহলে যে মহাপ্রলয়ংকর ঘটনা ঘটতো তা কেউ অনুমান করতে পারে না। তাতে দু'টি বিশ্ব ঠোকাঠুকি হয়ে সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যেত। এসব থেকে সহজেই স্পষ্টভাবে

অনুমান করা যায়, এই সব বিশ্বের সৃষ্টির পেছনে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার পেছনে নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনা আছে এবং **এই পরিকল্পনা অনুমান করার সাথে সাথে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এই মহাসৃষ্টির পেছনে একজন মহাপরিকল্পনাকারী স্রষ্টা আছেন।**

একটা গাড়ীকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিয়ে নিতে হলে, একজন ড্রাইভারের প্রয়োজন হয় এবং গাড়ীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রেকের প্রয়োজন হয়। **মহাবিশ্বের এই প্রচন্ড গতিশীল তারা, নীহারিকা, ছায়াপথকে প্রচন্ড গতিতে চালিয়ে নেয়ার জন্য নিশ্চয়ই একজন ড্রাইভার আছেন।**

কোন গতিসম্পন্ন যানকে একটা নির্দিষ্ট পথে চলতে হলে, তার পথসীমাকে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হয় এবং এই যানটি যাতে তার ঐ সীমার মধ্যে চলতে পারে সেজন্য তাকে মজবুতভাবে সীমারেখার সঙ্গে আটকে দিতে হয়। যেমন- একটি রেলগাড়ী নির্দিষ্ট পথে চলে এবং যাতে রেলগাড়ীটি ঐ নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ছিটকে না পড়ে, এজন্য তার পথের দু'পাশে সীমারেখা করে দেয়া হয়। এটা তো মাটির পৃথিবীর আইন-শৃঙ্খলার কথা কিন্তু মহাশূন্যে যেখানে কোন মাটির বাঁধন নেই, নেই কোন লোহার রেলপথ, সেই অনন্ত শূন্যতার বুকে রেলপথের মত অদৃশ্য নির্দিষ্ট পথে সীমানা কে স্থাপন করে দিল, যে পথসীমার ভেতরে প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ যুগ যুগ ধরে মহাপ্রচন্ড গতিতে নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলেছে, তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না? নিশ্চয়ই একজন মহাপরিচালক এবং মহাপরিকল্পনাকারী অনবরত পর্যবেক্ষণে না থাকলে মহাবিশ্বের এরকম সুশৃঙ্খল এবং প্রচন্ড গতিতে পরিক্রমণ মোটেই সম্ভব হত না।

বিজ্ঞানীরা কতগুলো মতবাদ (Theory) দিয়েছেন যা সকল মানুষ বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছে। বিশ্বজোড়া খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নিউটন বিজ্ঞান জগতে কতকগুলো অভ্রান্ত সূত্র প্রকাশ করেছেন, যা বিশ্বে সবাই মেনে নিয়েছে। সংক্ষেপে তার সূত্রগুলো আলোচনা করা হল ঃ

প্রথম সূত্র ঃ কোন বস্তু স্থির থাকলে চিরকাল স্থির থাকে এবং গতিশীল থাকলে চিরকাল গতিশীলই থাকতে চায় যদি তার উপর কোন বহির্বল প্রয়োগ করা না হয় অর্থাৎ কোন বস্তুর গতি সৃষ্টি না করলে গতিশীল হয় না এবং তাকে গতিশীল রাখতে তার পেছনে গতিসৃষ্টির কারণ থাকতে হবে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক অর্থাৎ যে বস্তু যত ভরবিশিষ্ট এবং তাকে যত বেশী বেগবান করতে হবে তাকে তত বেশী বল দিয়ে ঠেলা দিতে হবে।

তৃতীয় সূত্র ঃ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

মহাবিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র (Theory) মতে বিশ্বের বহু ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সারা দুনিয়ার সব জ্ঞানীগুণীরা তা অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জড় বস্তুতে গতি সৃষ্টি না করলে গতিশীল হয় না। এই যে মহাবিশ্বের কোটি কোটি তারকা, নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ সবই প্রাণহীন জড়পদার্থ এবং কল্পনাতীত ওজন এদের। আদিতে এসব জড়পিন্ডগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আপাততঃ আলোচনা না করে পরে করা হবে। মহাবিশ্বের এসব নীহারিকা, ছায়াপথগুলো যেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন, এরা সবাই জড় পদার্থ। প্রথম সৃষ্টির পরে এরা কেউ স্থির হয়ে থাকেনি, মহাপ্রচন্ড গতিতে ছুট দেয়া শুরু করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে,কোন জড়পদার্থ গতিসম্পন্ন হতে হলে নিশ্চয়ই তার ভেতর গতিসৃষ্টির কারণ অবশ্যই ঘটতে হবে এবং এটাও নিউটন বলেছেন যে, যে জিনিসের ভর যত বেশী, বস্তুপুঞ্জও তার ভেতর তত বেশী এবং তার ওজনও তত বেশী। মহাবিশ্ব জোড়া এই যে কোটি কোটি নীহারিকা, ছায়াপথ এদের এক একটি নীহারিকা বিশ্বের ভিতরে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে, এতে এদের ওজন হয়েছে কল্পনাতীত।

আমাদের মাটির পৃথিবীর ওজন হচ্ছে, ছয় কোটি কোটি কোটি টন। সূর্যের ওজন এর চেয়ে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ বেশী অর্থাৎ সূর্যের ওজন উনিশ লক্ষ আশি হাজার কোটি কোটি কোটি টন। লুব্ধক নক্ষত্রের একটি বেঁটে সাথী আছে, তার ওজন প্রায় সূর্যের ওজনের সমান। ভ্যানম্যানেনস নামে একটি নক্ষত্র আছে, যেটা পৃথিবীর চেয়ে আকারে একটু ছোট। তার ওজন সূর্যের ওজনের চেয়ে প্রায় সাতগুণ বেশী এর ওজন অর্থাৎ ১,৩২,০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, টন (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি টন)। নিউট্রন নক্ষত্রের ওজন ভ্যানম্যানেনস নক্ষত্রের চেয়ে যে কত কোটি গুণ বেশী হবে, বিজ্ঞানীরা তা আজও সঠিক করে বলতে পারেননি। এসব গ্রহ -নক্ষত্রসহ প্রায় দশ হাজার কোটি, কেউ কেউ বলেন বিশ হাজার কোটি নক্ষত্র নিয়ে আমাদের ছায়াপথ গঠিত।

বিজ্ঞানীদের মতে, এই ছায়াপথটির ওজন সূর্যের ওজনের চেয়ে এগার হাজার কোটি গুণ বেশী অর্থাৎ ছায়াপথের ওজন প্রায় (দুই হাজার একশো আটাত্তর কোটি কোটি কোটি কোটি টন) ২৭৭৮, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০ টন।

বিজ্ঞানী নিউটনের মতে, যে জিনিস যত ওজনের, তাকে একদিকে চালিয়ে নিতে হলে তার পেছনে ঐ পরিমাণ ঠেলা দিতে হবে এবং গতি বেগ যত অধিক করতে হবে, ঠেলাও

তত অধিক প্রয়োগ করতে হবে। এই যে ছায়াপথের মহা মহা ওজন, এই মহাওজনের ছায়াপথটিকে ঠেলা দিয়ে চালিয়ে নিতে একটা মহাশক্তি প্রয়োগকারীর আবশ্যক। এই মহাশক্তি প্রয়োগকারী কে? যিনি ছায়াপথটিকে প্রচন্ড গতিতে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে সৃষ্টির আদি থেকে অদ্যাবধি অবিরাম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

মহাবিশ্বের কেউ দাবি করে বলে না, ছায়াপথটিকে গতি সঞ্চার করেছি আমি। বিশ্বের কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক, কোন প্রেসিডেন্ট, কোন পালোয়ান, কোন যাদুকর, কোন যোদ্ধা বা কোন দেও-দানব কেউই দাবি করে বলতে পারেন না আমি মহাওজনের ছায়াপথটিকে কোটি কোটি নক্ষত্র তারকাসহ প্রচন্ড গতিতে চালিয়ে নিয়ে চলছি। কেউ কেউ অথর্বের মত যুক্তি করে বলে, ছায়াপথের এই গতি একা একাই সৃষ্টি হচ্ছে। একা একাই হচ্ছে এমনিই হচ্ছে, এসব বিজ্ঞান এবং যুক্তি বিরোধী বেকুবের কথা।

আগেই বলা হয়েছে, বিজ্ঞান বলে, কারণ ছাড়া ঘটনা ঘটেনা এবং গতি সৃষ্টি না করলে কোন গতি সৃষ্টি হয় না। যেমন- বলটিকে কিক না দিলে একা একা বল গোলে যায় না। আরও একটি ভাববার বিষয় হল, মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র তারকা নিজ নিজ কক্ষপথে এমন নির্দিষ্টভাবে ছুটে চলেছে যে, তাদের নির্দিষ্ট পথ হতে মুহূর্তের জন্য নড়াচড়ার কায়দা নেই। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র আপন নির্দিষ্ট পরিক্রমণ পথ হতে যদি কিছু স্থানচ্যুত হয়, তবে সমগ্র বিশ্বে যে ভীষণ বিপর্যয় ঘটবে, তা অনুভব করার আগেই সমগ্র বিশ্ব ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাবে, এক নক্ষত্রের সাথে অন্য নক্ষত্রের ঠুকাঠুকি হয়ে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই ঘটনা এই কারণে হবে যে প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে কেন্দ্রশক্তি যে কেন্দ্রশক্তির বলে সে নিজেকে তার নির্দিষ্ট পরিক্রমার পথে অন্য গ্রহের সাথে তাল সামলিয়ে ধরে রাখতে পারছে। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একটি অপরটির প্রবল টানে আপন কক্ষপথে টিকে আছে। একটি নক্ষত্র যদি কোন কারণে তার নির্দিষ্ট পথ হতে সরে যায়, তাহলে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র তারাগুলো একটির উপর আর একটি হুমড়ি খেয়ে এমন বেগে ছিটকে পড়বে যে, মুহুর্তের মধ্যে বিশ্বে সকল গ্রহ-নক্ষত্র ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে এবং মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে। খুবই ভাববার কথা কোন কোন নক্ষত্র সেকেন্ডে চব্বিশ/পঁচিশ হাজার মাইল বেগে ছুটে আপন কক্ষের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে। এই সঙ্গে বিশ্বের একদিকে ছুটে চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রচন্ড গতিতে অজানা লক্ষ্যের দিকে চলতে থাকে।

ভ্যানম্যানেনস একটি মহাওজনের নক্ষত্র, যার ওজন এক কোটি বত্রিশ লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি টন। এ নক্ষত্র যখন আপন কক্ষের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ মাইল

বিশাল এলাকা জুড়ে বৃত্তাকার পথে ঘুরে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। এই ঘোরার বেগ প্রতি সেকেন্ডে চব্বিশ/পঁচিশ হাজার মাইল। এই নক্ষত্রটি যখন একদিকে ছুটতে থাকে, তখন সে হাজার হাজার মাইল একেবারে সোজা পথে ছুটে এবং যখন সে ছুটা শুরু করে তখন তার প্রচন্ড গতিবেগ মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়তে থাকে। **এই গতিসম্পন্ন নক্ষত্রটি ব্রেক করে করে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে কি যে অসীম শক্তির প্রয়োজন হয় তা মানুষের কল্পনায় ধরা সম্ভব নয়।**

একটা মাল বোঝাই ট্রাক যদি এক হাজার মাইল উঁচু একটা পর্বতের উপর থেকে নিচের দিকে তীব্র গতিতে নামা শুরু করে, তবে মিনিটে মিনিটে তার গতিবেগ (Velocity) ঝড়ের বেগে বাড়তে থাকে। এই ট্রাকটি হাজার মাইল নীচে মাটিতে ঠেকার আগে তাকে আবার একই রকম গতিতে উপরে উঠিয়ে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে প্রচন্ডতম শক্তির প্রয়োজন। **প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথকে আপন কক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ঠিক রাখতে কত যে মহাশক্তির প্রয়োজন হয়, তা সেই মহাস্রষ্টা যিনি শক্তি প্রয়োগ করেন তিনিই জানেন।**

ভ্যানম্যানেনস তারকা এবং এ রকম অন্যান্য মহাওজনের নক্ষত্রকে মহাশূন্য পথে ঝুলিয়ে রেখে এদের মহাওজনের বেগকে তাল সামলিয়ে ঠিক রাখা কি চারটি খানি কথা! কেউ কেউ বলবে মহাকর্ষ এবং বহিকর্ষ শক্তি আর ছুটের বেগে এসব গ্রহ-নক্ষত্ররা ঠিক রয়েছে। কিন্তু এই বহিকর্ষ এবং মহাকর্ষ শক্তির উৎস কোথায়? কে এই শক্তি অলক্ষ্য থেকে গ্রহ-নক্ষত্রে ফুঁকে দিচ্ছেন?

যিনি এই মহাজ্ঞানের এবং মহাগতিশীল মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন তিনি তার ভাষায় ঘোষণা করেন, *"ওয়াল্লাহু জু কুওয়াতিম মাতিন"* (আল-কুর'আন) আল্লাহ্ই মহাশক্তির অধিকারী, যিনি মহাবিশ্বের মহাগতিকে নিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে চলছেন। তিনি আরও বলেন, *"ইন্না... আলবাব"* (আল-কুর'আন) নিশ্চয়ই মহাকাশসমূহ সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা-রাত্রির বৈপরিত্যের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন অর্থাৎ মহাবিশ্বের সৃষ্টির ভেতরে এবং দিবা-রাত্রির বৈপরিত্যের মধ্যে যারা জ্ঞানীলোক তারা আমাকে চেনার এবং আমার অস্তিত্বের অজস্র প্রমাণ খুঁজে পাবেন।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে এবং মৌসুমে মৌসুমে দিনরাতের পরিবর্তন ঘটে। রাত বড় হয়, দিন ছোট হয়, দিন বড় হয়, রাত ছোট হয়। আষাঢ়ের গগনভরা বর্ষার মেঘের ঘনঘটা, কালো মেঘে বজ্রের চমকানি, বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় প্রকৃতির নিবিড় সংলাপ, ফাগুনের নিদাঘে কোকিলের মধুর সুরে বসন্তের আগমন বার্তা, কালবৈশাখীর প্রচন্ড ঝড়ের ছোবল, আবার হেমন্তের নীলাকাশের ঘুমন্ত মেঘের নীরব হাতছানি,

শীতের রাতের কাঁপানো প্রহরে শেয়ালের আর্তরব, রাতজাগা শীতার্ত পাখীর ব্যথাতুর কোলাহল, প্রজাপতির রঙ্গিন পাখায় কার অলক্ষ্য তুলির চিত্রলেখা, গোলাপের বুকে কার মুধুর সুরভিমন্ডিত নিঃশ্বাস, পাতাবাহারের পাতায় কোন শিল্পীর সুনিপূণ তুলির নিরব আখর, দখিনা মলয়ে নবকিশলয় আর সবুজ পাতার মর্মর ধ্বনি এবং ভুবনের বৈচিত্রময় কত সৃষ্টি এবং তাদের কত বিচিত্র জীবন চিত্র!

এইসব সৃষ্টির বুকে কোন শিল্পীর নামই কি পাওয়া যায় না? জ্ঞানীজনের জ্ঞানে কি কোনই দোলা লাগে না? এইসব বৈচিত্রভরা অজস্র সৃষ্টির আদি কোথায়, উৎস কোথায়? তাই সে মহাস্রষ্টা আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিন দুঃখ করে বলেন, যারা বিশ্বের এই অজস্র লীলা দেখে, সেই লীলাময় আমাকে চেনেনা, তাদের কি হয়েছে? *"উলাইকা কাল আনআম বালহুম আদাল"* (আল-কুর'আন) "তারা পশুতূল্য বরং পশুর চেয়েও অধম।"

শনির আশ্চর্য খবর

শনি একটি অদ্ভুত গ্রহ যার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ আজও সঠিক ধারণা দিতে পারেন নি। ১৯৮০ সনের পরে ভয়েজার মারফত মোটামুটি কিছু ধারণা পাওয়া গেছে। শনির চারদিকে মেঘের মত বলয় আছে। তার উত্তাপ সৌরমন্ডলে সবচেয়ে বেশী। এই বলয়ের উত্তাপ হচ্ছে পঞ্চান্ন কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস। অর্থাৎ সূর্যের বহিরাবরণের চেয়ে উত্তাপ প্রায় তিনশো গুণ বেশী।

শনির উপগ্রহের সংখ্যা এ পর্যন্ত সতেরটি জানা গেছে। এরা নিজ নিজ কক্ষপথে শনি গ্রহকে পরিক্রমণ করে। দু'টি উপগ্রহের কক্ষপথ এমনইভাবে অবস্থান করছে যে, এই দু'টি উপগ্রহ চলতে চলতে কোন সময় কাছাকাছি হয়ে পড়ে এবং দু'উপগ্রহের মাথা ঠুকাঠুকি হয়ে সংঘর্ষ বেঁধে মহা সর্বনাশের সম্ভাবনা হয়ে উঠে। যখন একটি উপগ্রহ অন্য উপগ্রহটির কাছাকাছি হয়, তখন একটি উপগ্রহ অন্যটিকে কক্ষপথ ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে যায়। অন্য উপগ্রহটি তখন খোলা কক্ষপথে চলে যায়। আগের উপগ্রহটি আবার আগের কক্ষপথে হাজির হয়ে চলতে থাকে।

এবারে ভাববার কথা হচ্ছে, এগুলো জড় পদার্থ, এদের মাথা নেই, বুদ্ধি নেই এবং নীতি-জ্ঞানও নেই। অন্য একটি গ্রহের সঙ্গে ঠুকাঠুকি হয়ে মহাপ্রলয় ঘটার জ্ঞান-বিবেচনা এদেরকে কে দেন? একটি গ্রহ নিকটবর্তী হলে তাকে যে পথ ছেড়ে দিতে হবে এবং উভয়কে নির্ঘাত অপঘাতের হাত থেকে বাঁচতে হবে এ জ্ঞানটা কে দিলেন? আমরা জানি, একটা গাড়ী যদি পথ জুড়ে চলতে থাকে এবং অন্য একটি গাড়ী তার আগের গাড়ী হতে দ্রুত বেগে চলে পেছন থেকে আগের গাড়ীর কাছাকাছি হয় এবং ভীষণ সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা হয় তখন আগের গাড়ীটি দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে নিজে এক পার্শ্বে সরে গিয়ে পিছনের দ্রুতগামী গাড়ীটির চলার পথ ছেড়ে দেয়। এই ঘটনাটি একমাত্র গাড়ীটির ড্রাইভার থাকলেই না সম্ভব। গাড়ীর মাথায় কোন দিন কি বুদ্ধি জুটবে যে দুর্ঘটনার ভয়ে অন্য একটি গাড়ীর পথ ছেড়ে দেবে?

এ থেকে একটা মোটা জ্ঞানীর জ্ঞানেও স্পষ্ট বুঝে আসে যে, উপগ্রহ গাড়ীগুলোর ভেতরে নিশ্চয়ই একজন ড্রাইভার বা চালক রয়েছে। অনেকে যুক্তি করে হয়তো বলবে দু'গ্রহ কাছাকাছি হলে একটির চুম্বকত্ব শক্তি অন্যটিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে যতই উল্টাপাল্টা করা হোক, এই উপগ্রহ দু'টি কক্ষপথ পরিবর্তন করার পেছনে অবশ্যই একটি পরিকল্পনা আছে যা কাজে প্রতিফলিত করতে, এই কক্ষপথ পরিবর্তন করতে কোন বিধান সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, যার কারণে পরিবর্তন সম্ভব হয়। এ কথাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য, মহাবিশ্বে এমন কত অজানা মহাশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে চলছে! অতি ক্ষুদে মানুষ অনন্ত বিশ্বের কয়টা আশ্চর্যের খবর রাখে।

মহাভয়ংকর ভীষণ সুন্দর

প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে পূর্বাকাশের দিকে নজর করলে চির পরিচিত একটি আলোর ঝলমলানি চোখেমুখে প্রতিভাত হয়ে যায়। চির পরিচিত এই সূর্য এটা বয়ে নিয়ে আসে কত কবির কল্পনা। ভোরের গগনে প্রভাতী সূর্যের হাতছানি মুখরিত করে তুলে চারদিক। পাখির কলকণ্ঠে তার আগমনের সুরধ্বনি জাগে। ভোরের আকাশ স্বপ্নিল হয়ে যায়। সুপ্তোত্থিত দেহমনে কর্মপ্রেরণার সূচনা হয়। দখিনা মলয় তার অপেক্ষায় যেন প্রবহমান হয়ে উঠে। প্রকৃতির তরুলতা, পুষ্পসজ্জার সবই অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকে ভোরের সোনালী রোদটুকু বুকের পাথারে মাখিয়ে নেয়ার জন্য।

এই সেই সূর্য যার দেহখানি মাটির পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় অসহ্য তাপ ও চাপ রয়েছে এর বুকে। কি দিয়ে এই সূর্য গঠিত? বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্যের শরীরটা একটা গোটা অগ্নিপিন্ড। সূর্যের উপরিভাগের উত্তাপ হচ্ছে ছয় হাজার থেকে সাত হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস, এর কেন্দ্রের দিকে উত্তাপ হচ্ছে দেড় কোটি থেকে দু'কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস। কোন কোন সময় সূর্যের শরীরে যে অগ্নি ঝড় হচ্ছে, তা থেকে অতি প্রখর আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এটাকে বলা হয় সৌরচ্ছটা (Flare)। এই সৌরচ্ছটা তাপমাত্রায় প্রায় পাঁচ কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস হয়ে থাকে।

সূর্য এত আগুন কেমন করে পেল?

সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেনের চারটি নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। সে সময় কিছু বস্তুপুঞ্জ খোয়া যায় যেমনঃ এক কেজি অর্থাৎ এক হাজার গ্রাম হাইড্রোজেন থেকে নয়শো বিরানব্বই গ্রাম হিলিয়াম তৈরী হয়, বাকী আট

গ্রাম হাইড্রোজেন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সহজ কথায়, সূর্যের হাইড্রোজেন হতে হিলিয়াম সৃষ্টি হয় এবং কিছু হাইড্রোজেন খোয়া যায়। এই খোয়া যাওয়া হাইড্রোজেন হতে সূর্যে প্রচন্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফিউশন বলে। বিজ্ঞানীরা এভাবে হিসেব করে বলেছেন যে সূর্যকে অনবরত প্রজ্জ্বলিত রাখতে অর্থাৎ প্রচন্ড উত্তাপ ও আগুন জ্বালাতে প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন বস্তুপুঞ্জ বা লাকড়ি ক্ষয় হচ্ছে। সহজ কথায়, সূর্যকে এক সেকেন্ড জ্বালিয়ে তার তেজ এবং আগুন ঠিক রাখতে এর ভেতরে চল্লিশ লক্ষ টন লাকড়ি ঠেলতে হয়।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে, সূর্যের ভেতর যে পরিমাণ বস্তুপুঞ্জ আছে এবং যে প্রক্রিয়ায় তা প্রজ্জলিত হচ্ছে তাতে সূর্য নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, সেখানে সূর্যকে জ্বালিয়ে তার তেজ এবং আগুনকে ঠিক রাখতে লাকড়ি ঠেলার কথাটা কি রকম? আসলে লাকড়ি ঠেলার কথাটা সাধারণের জন্য একটা উপমা স্বরূপ।

একটি গ্যাস পাত্রে যদি হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসকে হাজার হাজার বছর একত্রে করে রাখা যায় হয়তো সেখানে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সৃষ্টি হবে না, এমন কি সেখানে প্রচন্ড উত্তাপেরও সৃষ্টি হবে না। কিন্তু বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল হাইড্রোজেন মিলে হিলিয়াম এবং প্রচন্ড তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একজন প্রযুক্তিবিদের প্রয়োজন। কে সেই মহা প্রযুক্তিবিদ!!

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুর'আন শরীফে সূরা ইয়াসীনের মধ্যে বলেন- *"ওয়াশ্ শামছু তাজরি লিমুস্তাক্বাররিল্ লাহা যালিকা তাকদিরুল আজিজুল আলিম।"* অর্থাৎ আর সূর্য উহার মঞ্জিলের দিকে চলিয়া যাইতেছে। ইহা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্ত্বা কর্তৃক নির্ধারিত।

৩য় অধ্যায়

মহাভাবনার কথা

বিজ্ঞানীরা বলেছেন সূর্যের বয়স প্রায় এক হাজার কোটি বছর। আবার কেউ কেউ বলেছেন পাঁচশো কোটি বছর। অধিকাংশের মতে সূর্যের বয়স এক হাজার কোটি বছর। প্রতি সেকেন্ডে যদি সূর্যের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখতে চল্লিশ লক্ষ টন লাকড়ি সূর্যের ভিতরে ঠেলে দিতে হয়, তাহলে এক হাজার কোটি বছরে মোট লাকড়ির পরিমাণ দাঁড়ায় (১৮,১১০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০) টন অর্থাৎ আঠারো লক্ষ এগার হাজার কোটি কোটি কোটি টন। কি মহা বিশাল এই সংখ্যা।

সূর্যের ওজন হচ্ছে ঊনিশ লক্ষ আশি হাজার কোটি কোটি কোটি টন। চল্লিশ লক্ষ টন লাকড়ি প্রতি সেকেন্ডে ক্ষয় হলে এ পর্যন্ত এক হাজার কোটি বছর যাবৎ যে লাকড়ি ক্ষয় হয়েছে তার ওজন বিশাল আকারের। সূর্যের ভেতরেই যদি সূর্যের বস্তুপুঞ্জ পুড়ে সূর্যের আগুন এবং তাপ ঠিক থাকত তাহলে উপরোক্ত হিসেবে দেখা যায়, সূর্য এতদিন প্রায় নিভে যেত এবং সূর্যের বস্তুপুঞ্জ পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হওয়ার কারণে সূর্যের ওজন একেবারেই হাল্কা হয়ে যেত। ফলে সূর্য তার কেন্দ্রশক্তির বেগ হারিয়ে নিজ কক্ষপথে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের টানে তাদের গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়ত। ফলে সমগ্র বিশ্বের নক্ষত্রগুলো কক্ষচ্যুত হত এবং ভীষণ বেগে ঠোকাঠুকি হয়ে হয়ে চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে যেত। সূর্য অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রকে যে বিপুল বেগে টানে একটা উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখে বলেন, যদি পৃথিবীর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে একটি করে অতি শক্ত খুঁটি পুঁতে দেয়া যায় এবং তার সঙ্গে একটি করে কঠিন লোহার শিকল বেঁধে দেয়া যায়, এই কোটি কোটি শিকলের মাথা অন্য একটি মহাশক্তিশালী নক্ষত্রের সাথে বেঁধে রাখা যায় এবং কাজটি যদি রাতের বেলায় করে রাখা হয়, তবে ভোরে যখন সূর্যের সাথে পৃথিবীর দেখা হবে এবং তখন সূর্য এই কোটি কোটি লোহার শিকল ছিঁড়ে পৃথিবীকে তার নিজ আওতার ভেতরে নিয়ে আসবে। কি ভীষণ শক্তি এই সূর্যের শরীরে!

এভাবে সূর্য তার চারিদিকে গ্রহ-নক্ষত্রকে মহাকর্ষের টানে তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঠিক রেখে নিজেও তার কক্ষপথে ঠিক রয়েছে। এভাবে টানাটানির কারণে মহাবিশ্ব ঠিক রয়েছে। সূর্যের বস্তু সম্ভার যদি পুড়ে শেষ হয়ে যেত, ফলে তার মহাকর্ষ শক্তি থাকত

না। ফলে মহাবিশ্বে মহাপ্রলয় কান্ড ঘটে যেত।

বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্য সৃষ্টির পর হতে সূর্যের মহাকর্ষ শক্তি এবং তার তাপমাত্রা মোটেও কমেনি। আবার বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন, এভাবে দিনে-রাতে পয়ঁত্রিশ হাজার কোটি টন লাকড়ি না পুড়লে সূর্যের তাপ ও আগুন ঠিক থাকত না। তাহলে মোটা জ্ঞানেও ধরা পড়ে, সূর্যের ভেতর প্রতিদিন পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টন লাকড়ি ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

আমরা জানি, কোন চুলোর পাশে বসে যদি কেউ ঐ চুলোর ভেতরে লাকড়ি ঠেলে না দেয়, তাহলে চুলোর আগুন নিভে যায়, এতে ভাত ও তরকারী রান্না হয় না এবং লাকড়ি কোন দিন একা একা চুলোর ভেতরে ঢোকে না। লাকড়ি জ্বালাতে হলে, একটা ম্যাচকাঠি বা অন্যকিছু দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হয়। চুলোর আগুন অনবরত ঠিক রাখতে একজন লাকড়ি ঠেলায় রত থাকতে হয়। যে চুলোয় অনবরত লাকড়ি না ঠেললে আগুন ঠিক থাকে না, সে চুলোর পারে অবশ্যই একজনকে লাকড়ি ঠেলার জন্য হাজির থাকতে হয় অথবা যে কোনভাবে চুলোর ভেতরে অনবরত লাকড়ি ঠেলার জন্য একটা ব্যবস্থা রাখতেই হবে।

এই যে মহাভয়ংকর সূর্যচুলো, এই সূর্যচুলোর আগুনকে অনবরত ঠিক রাখতে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন লাকড়ি নিশ্চয়ই কেউ ঠেলে দিচ্ছে এবং এই মহা তেজের চুলোর কাছে এমন একজন আছেন যে, চুলোর পাশে বসে লাকড়ি ঠেলেন কিন্তু সূর্যের তাপে জ্বলে যান না। কি ভীষণ শক্তিধর সে এবং কতইনা যোগ্যতা তার!!

সূর্যের মধ্যে মহাপ্রলয়ংকর ঘটনা অবিরাম ঘটে চলেছে। সূর্যের অনুগুলোর নিরবচ্ছিন্নভাবে বিস্ফোরণ হয়ে আগুনের প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে। এই ঝড়ের বেগ ঘন্টায় প্রায় এক লক্ষ মাইল। সূর্যের শরীর থেকে এই অগ্নিঝড়ের শিখা ঘণ্টায় প্রায় এক লক্ষ মাইল বেগে, তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ মাইল পর্যন্ত উর্ধ্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এত মহাপ্রচন্ড শব্দ হচ্ছে যে, মানুষের তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই।

এই অগ্নিঝড় যদি মাটির পৃথিবীতে একটু এসে লাগতো, তাহলে চোখের নিমিষে পৃথিবীর মানুষ, গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাটি, পাথর সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু সূর্যকে, পৃথিবীকে এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে এমন সুনিপুণভাবে মাপজোপ করে তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে চালনা করা হচ্ছে যে, এদের যে কোন একটি যদি আপন কক্ষপথ থেকে একটু নড়াচড়া করত এবং এদের অবস্থান এরকম না হয়ে যদি কিছু ব্যবধান হত, তাহলে মাটির পৃথিবীর মানুষ আমরা আমাদের সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়ে

আজ কোথায় যে থাকতাম তার কোন ঠিকানা পাওয়া যেত না!

ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে যে সূর্য, যার কারণে পৃথিবীতে সাম্য আবহাওয়া বিরাজ করছে, যে কারণে পৃথিবীতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু, প্রাণী, গাছপালা বেঁচে আছে। যদি এমন হত, সূর্যটা এক কোটি মাইল কাছে থাকত অথবা যিনি সূর্য এবং পৃথিবী স্বস্থানে বসিয়েছেন, তিনি যদি সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব সঠিক পরিমাপ না করতে পেরে পৃথিবীকে সূর্যের আর একটু কাছে বসিয়ে দিতেন, তাহলে কি ভীষণ ব্যাপারটাই না ঘটত! এতে কি কি মহাবিপর্যয় ঘটত, তা মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যাক।

সূর্য আমাদের মাটির পৃথিবী থেকে ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। যদি দূরত্ব কমে চার কোটি মাইল হত, তাহলে পৃথিবী বলতে কোন জিনিসের অস্তিত্ব থাকত না। সূর্যকিরণের তাপের চোটে সমস্ত সমুদ্রের পানি শুকিয়ে সমুদ্রের তলায় আগুন ধরে যেত, পৃথিবীর মাটি এবং গাছপালা পুড়ে শূন্যে উড়ে যেত। পাহাড়ের পাথরগুলো আগুন হয়ে জ্বলতে থাকত। যদি পৃথিবী এর চেয়ে আরও কাছে আসত, তাহলে সমস্ত পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে একটি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হত।

অনুরূপভাবে, সূর্য যদি তার বর্তমান অবস্থান থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থান করত, তাহলে পৃথিবীতে এমন শীতলতার সৃষ্টি হত যে, মানুষ তো দূরের কথা কোন প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না। সমগ্র পৃথিবীর নদীনালা সাগর মহাসাগরের পানি জমে বরফের কঠিন স্তরে পরিণত হত।

সূর্য মাটির পৃথিবীর জীবনীশক্তির প্রধান উৎস। সূর্য তার জ্বালানি পুড়িয়ে ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করে পৃথিবীর প্রতিটি জীবকে তার প্রাণস্পন্দন চালানোর অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলছে। সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সাধারণত সাত হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই তাপের অতি পরিমিত তাপ পৃথিবীতে এসে পড়ে ফলে, জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘন্টায় এক হাজার মাইল বেগে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় একবার ঘুরপাক খাচ্ছে অর্থাৎ বর্তমান আপনি যেখানে বসে আছেন এক ঘন্টা পর আপনি এক হাজার মাইল দূরে অবস্থান করবেন। পৃথিবীর এই গতি যদি প্রতি ঘন্টায় একশো মাইল হত, তাহলে কি ভয়ংকর ব্যাপারটাই না ঘটত! তাহলে দুইশো চল্লিশ ঘন্টায় দিবারাত্রি হত অর্থাৎ বর্তমান দশদিনে তখনকার একদিন এবং বর্তমান দশ রাত্রে তখনকার একরাত্রি হত। ফলে চৈত্র-বৈশাখ মাসের ভীষণ রৌদ্রের মধ্যে এতবড় দিন হলে কি ভয়ংকর ঘটনাইনা ঘটত! আবার শীতের এত দীর্ঘ রাত!! এত বিভিন্ন ধরনের বিবেচনা করে পৃথিবীকে সূর্য হতে মেপেজুপে ঠিক জায়গামত স্থাপন করা কি চারটিখানি কথা? সূর্য থেকে পৃথিবীর এ বিশাল দূরত্ব পরিমাপ করা কি সহজ কথা?

আর একটি মহাচিন্তার কথা এই যে, পৃথিবী তার কক্ষপথে সাড়ে তেইশ ডিগ্রী কোণ

করে ঘুরছে। যদি এভাবে না ঘুরে শূন্য ডিগ্রী কোণ করে ঘুরতো, তাহলে পৃথিবীর উভয় মেরুতে আলো পৌঁছত না এবং সূর্যতাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পাকারে উত্থিত হয়ে উত্তর কিংবা দক্ষিণ মেরুর দিকে ধাবমান হত। ফলে , বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন সম্ভব হত না। পৃথিবীর মধ্যস্থল সম্পূর্ণ মরুভূমি হয়ে যেত বায়ুমন্ডল একেবারে হাল্কা হয়ে যেত এবং পৃথিবীর উপরিভাগ উল্কাপাতের কারণে ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন ঃ বায়ুমন্ডল হাল্কা হওয়ার কারণে চন্দ্রের উপরিভাগে উল্কাপাত হয়েছে এবং সেখানে উল্কাপাতের কারণে এত বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে যে, তার কোন কোন গর্তের ভেতর কোলকাতা শহরকে সহজেই ঢুকিয়ে দেয়া যায়।

যিনি সূর্যকে এত পরিমাপ করে অবস্থান করিয়েছেন, তিনি যে আমাদের জন্য কত বড় নিয়ামত আষাঢ়ের বারিধারার ন্যায় বর্ষণ করে চলেছেন, সূর্য এবং পৃথিবী এরকম অবস্থিত থাকার কারণে আমরা সে নিয়ামতের কিছুই অনুভব করতে পারিনে।

সূর্য এবং পৃথিবী এ রকম দূরত্বে থাকার কারণে আমরা যে এ রকম মানুষরূপে বাঁচতে পারছি, এরকম আরাম করে পৃথিবীর সম্ভার ভোগ করে চলেছি, বন্ধু এবং প্রিয়জন নিয়ে চলেছি, সুখের সংসার পেতেছি, এজন্য কি সূর্য এবং পৃথিবী সৃষ্টিকারীকে বিনিময়ে একটা ধন্যবাদ দেয়াও উচিত ছিল না তিনি যেই হোন না কেন।

শান্ত মাটির পৃথিবীর শান্ত মানুষ আমরা। সূর্য থেকে ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে কিছুতেই আমরা অনুমান করতে পারিনে এই মহাবিশ্বে কি মহাপ্রলয়ংকর ঘটনা ঘটে চলেছে। মহাস্রষ্টার মহাসৃষ্টি, মহালীলা মানব জ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম পরিসর দিয়ে এবং ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি দিয়ে মহাজাগতিক ঘটনাগুলো অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। এজন্য অনেক লোকই স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বসে। মহাস্রষ্টার তুলনায় মানুষ একটা অতি ক্ষুদ্র ছারপোকার চেয়েও নগণ্য।

একটা যুদ্ধক্ষেত্রে কত অজস্র কামান গর্জন করে। উড়োজাহাজ থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, চতুর্দিকে গগনফাটা চিৎকার, অস্ত্রের ঝনঝনানি ইত্যাদি মহা তুমুল কান্ড কারখানা চলতে থাকে। **মনে করা যাক, এই যুদ্ধটি হচ্ছে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত জাপানে। সেই মুহূর্তে আমেরিকার একটি গরীব মানুষের রান্নাঘরে একটি জীর্ণ খাটের পুরনো তক্তার ফাঁকে পুরনো আবর্জনায় জড়িয়ে একটি ক্ষুদ্র ছারপোকা জাপানের ঐ যুদ্ধের দৃশ্যটা কি অনুমান করতে পারবে? এই যুদ্ধের হোতা কে তা কি সে বলতে পারবে বা তা কি তার জ্ঞানে ধরবে?**

জাপান থেকে প্রায় বিশ হাজার মাইল দূরে বসে এই ক্ষুদ্র ছারপোকাটি মনিবের

চাকরের গায়ের একটু খানি রক্ত চুষে খেয়ে পেট ভরে পাটির তলে শুয়ে মন্তব্য করবে, যুদ্ধের সৃষ্টিকারী বা মহাযুদ্ধ বলতে কিছু নেই, এসব আমি বিশ্বাস করিনে। কারণ, যুদ্ধ কে বাঁধায় তাকেও দেখিনে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কি ঘটে তাও বুঝিনে। তাই এসব মিছে কথা। আসল কথা হচ্ছে, আমি একটুখানি রক্ত খেয়ে পাটির তলে শুয়ে থাকতেই জীবনটাকে সার্থক মনে করি এবং আমার বাক স্বাধীনতা রয়েছে, যা আমার মনে হয় তা বলতে পারি।

ছারপোকার মত একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা চারটি খাওয়া, অলস জীবন-যাপন করা এবং মন যা বলে তা বল্গাহারা যুক্তিতে করাটাকেই বড় মনে করে। সে কোথায় একদিন নির্লিপ্ত ছিল এবং একদিন যে বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনে হারিয়ে যাবে তাও সে জানে না। সে যে একটা পরিকল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি তার এই মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই অদ্ভুত ধরনের মানুষ শিল্পটির পেছনে একজন শিল্পী যে ছিল, তা কিছুতেই তার ছারপোকা জ্ঞানে ধরা পড়ে না। কাজেই সে শিল্প নিয়ে চিরদিন ব্যস্ত থেকে গেল, শিল্পীর কোন খবর করল না। সে জড়বাদী হয়ে দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেল, তার জীবনে ভক্তি রস এল না। সে কোনদিনও ভাবতেই পারল না,ঐ মহাকাশ, ঐ নীহারিকা, গ্রহপুঞ্জ কার ইশারা, কার ইংগিতে বয়ে চলেছে।

আরও কয়েকটি ভাবনা

আগেই বলা হয়েছে, যিনি সূর্য এবং পৃথিবীকে স্ব-স্ব স্থানে স্থাপন করেছেন, তিনি যদি এই দু'য়ের দূরত্বের সঠিক পরিমাপ করে বসাতে না পারতেন তবে অনেক রকমই হতে পারত।

১। মানুষ যেমন আছে তেমন থাকতে পারত না। সূর্য পৃথিবীর আরও কাছে থাকলে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডল অত্যন্ত হাল্কা হয়ে পৃথিবীতে ভীষণ উল্কাপাত হত এবং মানুষের জন্য সর্বনাশ হত।

২। পৃথিবী যদি সূর্য থেকে আরও দূরে থাকত, তবে মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় ছেড়ে দিলে, সে বরফ হয়ে দশা ধরে জিংরা হয়ে থাকত। কারো মুখে স্রষ্টার সম্বন্ধে কোন কথাই বের হত না, গাছপালা জমে যেত, অক্সিজেন পালিয়ে যেত তেপান্তরের মাঠে। প্রিয়জনের হৃদপিন্ড যেত বন্ধ হয়ে, চোখের তারায় এত আলোভরা যামিনী, প্রিয়তমার এত রূপ, ফিলোসোফি সব ষ্টপ হয়ে যেত।

এত আরামে বাস করে, দক্ষিনা বাতাস বুকে লাগিয়ে, ফুলের সুরভী নাকে মেখে, আরামে গা এলিয়ে দিয়ে, এত শান্তি-সুখের স্বপ্ন দেখা চলতো না। যে সব জ্ঞানান্ধরা বলেন-বিশ্বের এসব একা একাই হচ্ছে, সূর্য এবং পৃথিবীর পরিক্রমণ উভয়ের মধ্যে

সমতাল রেখে একা একাই সংঘঠিত হচ্ছে, তাদের ভেবে দেখার জন্য মহাস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন নিরংকুশভাবে ঘোষণা করছেন, *"ইন্না ফি খাল্কিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াখতিলা ফিল্ লাইলি ওয়ান্-নাহার, লা আয়াতি লি উলিল আলবাব"* (আল কুর'আন)- অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহাকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি আর দিবারাত্রির বৈপরিত্যের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে (আল্লাহু রাব্বুল আলামিনকে চিনবার জন্য) অকাট্য নিদর্শনসমূহ।

ময়ূর যে নৃত্য করে তার পা দু'টি কোথায়?

পৃথিবীতে সর্বপ্রকার জীবন ধারণের মূল ধারা হচ্ছে সূর্য। মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকে? মাতৃগর্ভের শুরু থেকে সমাধি পর্যন্ত মানুষ প্রতিনিয়ত একেবারেই অসহায়ভাবে সূর্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে আছে। এটা কেমন করে হয়?

মাতৃগর্ভে মানুষ যখন থাকে তখন তার মা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খায়। এতে তার দেহ ঠিক থাকে এবং সে জীবন্ত থাকে। এই বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যদি পৃথিবীতে না থাকত, তাহলে মাতৃগর্ভেই শিশুর জীবনলীলা শেষ হয়ে যেত। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ওপর নির্ভর করে মায়ের শরীর যখন সজীব থাকে, মা-এর নাড়ীর সাথে গর্ভস্থিত শিশুর নাড়ী সংযুক্ত থাকে। এই নাড়ীর ভেতর দিয়ে মায়ের দেহ হতে পুষ্টি শিশুর দেহে প্রবেশ করে।

'মা' খাদ্যের উপর নির্ভরশীলা এবং গর্ভস্থিত শিশু মায়ের উপর নির্ভরশীল। এই যে চোখের সামনে আমরা এত খাদ্যসম্ভার দেখি এবং তা ভোগ করে আমরা জীবনকে পরিপুষ্ট করি, পৃথিবীতে এত রং বেরংয়ের খাদ্যসম্ভার কোত্থেকে আসে, তা একটু আলোচনা করা দরকার।

কে সেই মহা শক্তিধর?

আগেই বলা হয়েছে, অনন্ত শূন্য সাগরে মহাবিশ্বের দশ হাজার কোটি মহাবিশ্ব একত্র করে, একত্রে একটি ডিমের খোসার মত অনন্ত শূন্য মহাসাগরের এক কোণায় ভেসে আছে আর সমস্ত সাগরটাই শূন্য পড়ে আছে। এই মহাবিশ্ব এবং অনন্ত শূন্য জায়গা বিশ্বের কেউ সৃষ্টি করেছে বলে দাবি করে না, কেউ বলে না, এই মহাবিশ্ব আমার সম্পত্তি এবং এর ওপর আমার একচ্ছত্র আধিপত্য এবং আমিই বা আমরা এই মহাবিশ্ব, অনন্তশূন্য জায়গা সৃষ্টি করেছি।

একমাত্র এক পরাক্রমশালী মহাশক্তি আছেন যিনি দাবি করে বলেছেন, *"আল্লাযী লাহু মুলকুছ ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদ"* (আল কুর'আন)-এ মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছি আমি এবং এর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা আমার। তিনি আরও দাবী করে বলেছেন, *"লিল্লাহি মা ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ"* (আল কুর'আন)-আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে (দৃশ্য-অদৃশ্য) সবই আমার (আর কারও নয়)। তিনি আরও বলেন, *"ওয়াছিয়া কুরছিয়্যিহুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ"* (আল কুর'আন)। একেবারে শেষে তিনি বলেছেন, অনন্ত শূন্যতা এবং দশ হাজার কোটি মহাবিশ্ব আমার কুরছির (বসার আসন) নীচে চারটি পায়ার ভেতরে আছে এবং আমার কুরছিটি (আসনটি) অসীম শূন্যতায় এবং মহাবিশ্বের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এসব কিছুর নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ করতে তার মোটেই বেগ পেতে হয় না। তাই তিনি আরও বলেছেন, *"ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলীউল আজীম"* (আল কুর'আন) এবং এই মহাসৃষ্টি হেফাজত করতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয় না। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনি উচ্চ, সুমহান এবং সবার উপরে বড়।

উদ্ভিদকে খাদ্য তৈরীর প্রধান উৎস বলা হয় এবং উদ্ভিদের সবুজ পাতাতেই এই খাদ্য তৈরী হয়। এজন্য পাতাকে খাদ্য প্রস্তুতের কারখানা বলা হয়। গাছ মাটি থেকে শিকড় বা মূল দিয়ে রস শোষণ করে পাতায় নিয়ে হাজির করে। আবার গাছ তার পাতার ছিদ্র (পত্ররন্ধ্র) দিয়ে বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Co_2) শোষণ করে পাতাতেই জমা করে। এবারে সূর্যকে পাতার মধ্যে খাদ্য তৈরীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হয়।

সূর্যকিরণ পাতায় পড়ে পাতার সবুজ পদার্থে (Chlorophyl) উত্তেজনা সৃষ্টি করে মূল দ্বারা শোষিত রস এবং পাতার ছিদ্র দিয়ে বাতাস থেকে সংগ্রহ করা কার্বন-ডাই-অক্সাইড দু'টোকে একত্রে মিলিয়ে (রাসায়নিক বিক্রিয়া করে) গ্লুকোজ ও অক্সিজেন সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে আলোক সংশ্লেষণ (Photocynthesis) বলে। গ্লুকোজ গাছের আয়তন শক্তি (কলেবর) বৃদ্ধি করে, সজীব রাখে এবং ফল-মূল সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। আর অক্সিজেন গাছ থেকে বের হয়ে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই অক্সিজেনই আমাদের জ ীবনী শক্তির মূল।

স্রষ্টার একটি অপূর্ব কৌশল এবং তার অস্তিত্বের একেবারেই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে গাছের এই সবুজ পাতা।

আগেই বলা হয়েছে, গাছ মূল বা শিকড় দিয়ে মাটি হতে রস সংগ্রহ করে। এই রস পাতায় জমা হয়। পাতার উপরিভাগটি এক প্রকার অচিন্ত্যনীয় রাসায়নিক পদার্থ (কিউটিক্যাল স্তর) দ্বারা লেপে মসৃণ করা হয়েছে। স্রষ্টার এই আশ্চর্য সৃষ্টিকৌশল দেখে সমস্ত জীববিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করে বলেছেন, "স্রষ্টা যে একজন আছেন, পাতার ওপরে এই মসৃণ প্রলেপ তার অস্তিত্বের এক মহানিদর্শন মহাস্বাক্ষর এবং এ পাতার এই প্রলেপের পেছনে একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনাকারী না থাকলে নিশ্চয়ই পাতার এরকম হওয়া

সম্ভব হত না" পাতার উপরিভাগে যদি রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ না থাকত, তাহলে বিশ্বের সমস্ত গাছপালা, গুল্মলতা সব মরে শেষ হয়ে যেত কারণ, গাছ মূল দিয়ে মাটি থেকে যে রস সংগ্রহ করে, সে রস পাতায় গিয়ে জমে, যদি পাতার উপরিভাগে রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া না থাকত, তাহলে গাছ মূল দিয়ে যে রস শোষণ করত, তা পাতার উপরিভাগ দিয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত এবং গাছ রসশূন্য হয়ে যেত, খাদ্য প্রস্তুত বন্ধ হয়ে যেত এবং অক্সিজেনও বন্ধ হয়ে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রাণী জগতের অবসান হত।

এই মর্মে সেই মহাপ্রকৌশলী ঘোষণা করেছেন, "নিশ্চয়ই জ্ঞানীজনের জন্য রয়েছে আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিরাজির ভেতরে আমার অস্তিত্বের অপার নিদর্শনসমূহ" (আল কুর'আন), অর্থাৎ জ্ঞানহীন লোকেরা এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে এবং পৃথিবীর বিচিত্র সৃষ্টিরাজি থেকে কোন জ্ঞানই সংগ্রহ করতে পারেনা। তারা অথর্বের মত শুধু ভোগ করে যায়, ভোগের কারণ জানে না এবং জ্ঞানের রোগ টের পায় না।

সূর্য আর একটি প্রধান খাদ্য উপাদান আমিষেরও উৎস অর্থাৎ সূর্যালোক এবং সূর্য তাপ ছাড়া উক্ত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী সম্ভব নয়। বাতাসের ভেতর শতকরা আটাত্তর ভাগ নাইট্রোজেন, শতকরা সাড়ে বিশ ভাগ অক্সিজেন এবং বাকী দেড় ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, বাষ্প ধূলিকণা ও নিস্ক্রিয় গ্যাস ইত্যাদি। ডাল, মাছ, আলু ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক প্রণালীতে ভেঙ্গে এমাইনো এসিডে পরিণত হয় এবং দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে। অবশিষ্টাংশ মূত্রের সাহায্যে দেহ হতে বের হয়ে যায়। এই এমাইনো এসিডের প্রধান দু'টি উপাদান হল বায়ুর নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন। এখন জানার বিষয় এই যে, বাতাসে উক্ত পদার্থ দু'টি কি প্রক্রিয়ায় আমাদের জীবন প্রবাহে আমাদের অজান্তে সর্বদা কাজ করে চলছে।

এখানে আমরা নাইট্রোজেন সম্পর্কে আলোচনা করব। বাতাসের নাইট্রোজেন গাছপালা সৃষ্টি এবং কলেবর বৃদ্ধির জন্য বায়ু থেকে দু'পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে থাকে। বৃষ্টির সময় যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অক্সাইড সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নাইট্রিক এসিডে পরিণত হয় এবং মাটির মৌলিক উপাদানের সাথে মিশে নাইট্রিক লবণ সৃষ্টি হয়। এই লবণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গাছ মাটি থেকে শুষে নেয়। আবার কোন কোন উদ্ভিদ যাদের গুটি হয়, যেমনঃ সীম, মটর, এরা সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন চুষে নেয়। এই নাইট্রোজেন জনিত সার পেয়ে গাছ ফুলে ফলে ভরে ওঠে এবং এ উদ্ভিদ থেকে আমরা আমিষ জাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকি। উদ্ভিদের পাতা পড়া, প্রাণীর বর্জ্যদ্রব্য ত্যাগ, এমনকি প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যুর পর তার বিধ্বংসীপাতনে, ডি-নাইট্রোফাইং ব্যাকটেরিয়া

দ্বারা পচন প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন আবার বায়ুতে ফিরে আসে এবং বায়ুর সমতা রক্ষা করে। একে নাইট্রোজেন চক্র বলা হয়।

এই নাইট্রোজেন চক্রের মূলে রয়েছে সূর্য। এই সূর্যই নাইট্রোজেন চক্রের পেছনে অলক্ষ্যে কাজ করে চলছে। সূর্যতাপ সমুদ্রপৃষ্ঠে পড়লে সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে এবং নিম্নচাপবিশিষ্ট স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয়। এই মেঘের সঞ্চালন এবং আহ্নিক গতির কারণে বায়ুর ভেতর উলট-পালট শুরু হয়। আবার মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ চমকায় এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক মতবাদটি হুবহু পবিত্র কুর'আন শরীফে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, *"তাসরিফুর রিয়া"* অর্থাৎ বাতাসের ভেতর রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। *"বায়নাল মুছাখ্খারা"* অর্থাৎ অতঃপর মেঘমালাকে আসমান ও জমিনের মাঝখানে (ঝুলন্ত অবস্থায়) রাখি।"

আল্লাহ্পাক আরও ফরমায়েছেন, *"রাদু ওয়া বরকু"* অর্থাৎ মেঘমালাগুলোতে ধাক্কা লেগে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। এইখানে আল্লাহ পাক নাইট্রোজেন চক্র সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আন শরীফে আরও আছে, *"ওয়া আনাজালনা মিনাল মু'ছিরাতে মা আন ছাজ্জাদা লিনুখরিজা বিহি হাব্বা ওয়া নাবাতা"* অর্থাৎ এবং আমি সেই মেঘমালা হতে মুসলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করি, খাদ্য শস্য এবং আহার্য সৃষ্টি করার জন্য। এইভাবে আধুনিক নাইট্রোজেন চক্র সম্বন্ধে পনেরশো বছর পরে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে কুর'আন শরীফের এ তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সূর্যই প্রত্যক্ষভাবে নাইট্রোজেন চক্রের পেছনে অলক্ষ্যে কাজ করে চলছে এবং গাছপালা, পৃথিবীর যাবতীয় লতাগুল্ম ইত্যাদিকে জিইয়ে রেখেছে, মাঠকে করেছে শস্য-শ্যামল, ফুলকে করেছে প্রস্ফুটিত, বাতাসকে করেছে সুরভিত, সঞ্চালিত করেছে প্রাণীকুলকে, সুর দিয়েছে পাখির কণ্ঠে, আর ভাষা দিয়েছে মানুষের ওষ্ঠে, ধমনীর ভেতর প্রবাহিত করেছে উষ্ণ রক্ত, আর ভ্রমরের গুঞ্জরণ দিয়ে আপ্লুত করেছে ফুলের সুষমাকে। এই সেই সূর্য, যা প্রজ্বলিত না থাকলে পৃথিবীর সর্বপ্রকার প্রাণের স্পন্দন নিমিষের মধ্যে চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যেত। তাই এই সূর্যের মহাস্রষ্টা আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, *"ফাবি আইয়ে আলায়ি রাব্বি কুমা তুকাজ্জিবান"* (আল কুর'আন) অর্থাৎ (এত নিয়ামত পেয়েও) তবু কি তোমরা আল্লাহ্কে মিথ্যা অপবাদ দিবে (অবিশ্বাস করবে)?

আসল নিমক হারাম

নিমকহারাম কাকে বলে? যে নুন খেয়ে গুণ গায় না অর্থাৎ উপকারীর উপকারের ঋণ

স্বীকার করে তাকে ধন্যবাদ দেয় না। সূর্যের কিরণ গাছের পাতায় না পড়লে, পাতার ভেতরে গ্লুকোজের সৃষ্টি হত না। সহজ কথায়, গ্লুকোজ অর্থ শর্করা বা চিনি জাতীয় জিনিস। এই গ্লুকোজই আবার সম্পূর্ণ গাছটাকে সজীব রাখে এবং যাবতীয় ফলমূল ও শস্যাদি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। গাছের পাতায় গ্লুকোজ সৃষ্টি না হলে আম গাছে আম ধরত না, কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ধরত না। ধান, গম, যব ইত্যাদি শস্যক্ষেত্রে চাষী গিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে দেখত ধান গাছ, গম গাছ, যব গাছ ইত্যাদি সমস্ত শস্যগাছ শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ (Photosynthesis) না হলে, গ্লুকোজ সৃষ্টি হত না। আবার গ্লুকোজ সৃষ্টি না হলে, গাছই বাঁচত না, ফলমূল তৈরির তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

এবারে চিন্তা করে দেখা যাক, খেতে বসে অতি তৃপ্তির সাথে দুধের সাথে মিষ্টি আম দিয়ে, কাঁঠাল দিয়ে, সবরি কলা দিয়ে মেখে, সাথে কিছু চিনি মিশিয়ে খেয়ে প্রাণভরা তৃপ্তি পাওয়া গেল। এই আম, কাঁঠাল, চিনি, কলা, সবই মনে করা যাক বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল। এগুলো যারা বিক্রি করল, এদের সবাইকে কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে দাম দেয়া হল অর্থাৎ তাদের মজুরীর দাম দেয়া হল। চাউলটা যে দোকান থেকে কেনা হয়েছিল, পয়সা দিয়ে তার পাওনা শোধ করে দেয়া হল। এসব যদিও অত্যন্ত সাধারণ কথা, সাধারণ জ্ঞানের কথা। বেকন নামে একজন বড় দার্শনিক বলেছেন, "সাধারণ জ্ঞান অত্যন্ত অসাধারণ জিনিস।" সাধারণ জ্ঞানকে অসাধারণ মনে না করার কারণেই অনেক অসাধারণ সমস্যার সমাধান হয় না।

এবারে যিনি এই বিভিন্ন রকম ফলমূল শস্যপাতি, দুধ, চিনি ইত্যাদি খাদ্যসম্ভার সৃষ্টি করে মানুষকে এত অজস্র রকমের উপাদেয় নিয়ামত খাওয়াচ্ছেন, তিনি কি নির্দেশ দেন।

আগেই বলা হয়েছে, কারণ ছাড়া ঘটনা ঘটে না। এই যে পৃথিবীর অজস্র রকমের ফলমূল খাদ্যসম্ভার এবং মানুষের যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে, এর আসল কারণ কোথায়? এর মূল উৎস কোথায়?

মানব জীবনের জীবন ধারণের উপযোগী যাবতীয় উপকরণের মূল কারণ হচ্ছে সূর্য। আগেই দেখান হয়েছে, সূর্যের কিরণ গাছের পাতায় না পড়লে আমাদের জীবনের কি সর্বনাশ হত। অপরদিকে সূর্য পৃথিবীতে তাপ এবং বায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে। সূর্যের কিরণ বিশাল সাগরের পানির বুকে পড়ে, সমুদ্রের পানিকে অলক্ষ্যে জ্বাল দিয়ে বাষ্পে পরিণত করে। এই সূর্যের তাপের কারণে বাতাস ওলটপালট হয় এবং বাষ্পকে বাতাস শূন্যে তুলে নেয়। সেই বাষ্প আকাশের দিকে উঠলে আকাশের শৈত্যের (Humidity) কারণে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বিন্দুর আকার ধারণ করে এবং মেঘমালা হয়ে আসমান এবং জমিনের মাঝখানে ঝুলতে থাকে। পরে সূর্যের কারণে নিম্নচাপে বাতাস থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায় মৃত ধরণীর দিকে এবং পরে মুসলধারে বর্ষণ হয়। এ সবই অলক্ষ্যে সূর্যের

তাপ, আলো ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে।

তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যই পৃথিবীর শক্তির মূল কেন্দ্র। এবার সূর্য কোথা থেকে শক্তি পায় এবং সূর্য কোত্থেকে এত তাপ, এত আলো পায় তা সূর্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বলেছেন, সূর্যের শরীরে অতি প্রচন্ড চাপ এবং তাপ আছে। তার কেন্দ্রে প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপ আছে এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আট কোটি মণ চাপ আছে। এই প্রচন্ড তাপ এবং চাপের ফলে সূর্যের শরীরের অণুগুলোর (Atom) অনবরত বিস্ফোরণ (Fusion) হচ্ছে। এতে করে সূর্যের চারিদিকে বিপুল তাপ এবং আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্যের শরীরে এত তাপ আর কিরণ আছে যে, এর পরিমাণ যদি সর্বমোট আঠার কোটি টাকা মনে করা হয়, তবে আমাদের মাটির পৃথিবীতে মাত্র তার 'ন' টাকা পরিমাণ আলো এবং তাপ এসে পড়ে, আর অবশিষ্ট অংশ অন্যদিকে ছড়িয়ে যায়।

সূর্যের ভেতরে বিপুল পরিমাণ অণু (Atom) বিস্ফোরণ হওয়ার কারণে, সহজ কথায়, সূর্যের যে ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন অর্থাৎ সূর্যের আলো এবং তাপ জ্বালিয়ে রাখতে প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন লাকড়ি সূর্যের ভেতর ঠেলতে হয়। এই ভাবে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টন লাকড়ি সূর্যের মধ্যে ঠেলতে হয় তবে তো সূর্য তার তাপ আগুন নিয়ে ঠিক থাকে এবং তার কারণে আমাদের সকলের এবং গাছপালার জীবন বেঁচে থাকে।

অনেকে বলে, পৃথিবীর সকল ফসল ফলাই আমরা, গাছপালা রোপণ করি আমরা, ধান কাটি আমরা, চাউল তৈয়ার করি আমরা, অফিস আদালত আমরাই চালাই, অফিসের পয়সা পেয়ে বাজার থেকে চাল ডাল কিনে খাই। আল্লাহ্ যদি থেকেও থাকে তার কোন কাজ নেই। যার কোন কাজ নেই, তাকে ধন্যবাদ দেয়ার কোন দরকার নেই। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ ধর্মের অনুষ্ঠানই আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়ার একটা প্রক্রিয়া মাত্র।

আল্লাহ্‌র উপর আমাদের কি কর্তব্য ছিল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল কিনা তাই জানানোর জন্য শুধু ছুবহান আল্লাহ্, আল্‌হামদুলিল্লাহ্ এবং নামাজ পড়া হয়। আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিন পৃথিবীর কোন ধানক্ষেতে ধান ফলাতে আসেন না, ফলমূলের চাষ করতে আসেন না এবং মানুষের রান্না ঘরে রান্না করতেও আসেন না, তিনি সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ টন লাকড়ি ঠেলে সূর্যটাকে জ্বালিয়ে রেখে আমাদের জ্ঞানের অজান্তে অলক্ষ্যভাবে পৃথিবীর সকলের জীবনীশক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি এই যে চব্বিশ ঘন্টা সূর্যের ভেতরে এত কোটি টন লাকড়ি ঠেলে সূর্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তার জন্য বিশ্বে কারও কাছে কোনদিন তিনি প্রতিদান চাননি।

তাই তিনি পরিতাপ করে বলেন, *"আফালা তা' কিলুন"*—"হে মানুষ তোমাদের কি বিবেক নেই। তোমরা কি একটু বিবেচনা করে দেখ না, এই যে বাজার থেকে একটি কাঁঠাল কিনে আনলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে, রসগোল্লার মত রসালো রোয়াগুলো বের করে খেয়ে কত শান্তি পেলে। এই কাঁঠালটি যার নিকট থেকে কিনে আনলে, সে শুধু কাঁঠালটি গাছ থেকে কেটে এনে তোমার হাতে দিল। তার বদলে তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্জিত পঞ্চাশটি টাকা তাকে দিয়ে কাঁঠালটি কিনে নিলে। এ কাঁঠালটি এ রকম করে তৈরী করার পেছনে যে ঘটনা ঘটেছে, তা কি তুমি অনুধাবন করে দেখেছ?

এই কাঁঠাল গাছটি আমাকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল। আমি এই মাটি সৃষ্টি করেছি, সূর্যের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ টন লাকড়ি প্রতি সেকেন্ডে ঠেলে তাকে প্রজ্বলিত রেখে তার তাপ এবং আলো কাঁঠাল গাছের পাতায় ইনজেকশন করে দিয়ে কাঁঠালকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করেছি এবং তার ভেতরে মনোরম রসাল কোষ সৃষ্টি করেছি।

এদিকে সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানিকে বাষ্প করে শূন্য দিয়ে উড়িয়ে এনে বৃষ্টির আকারে কাঁঠাল গাছের পাতায় ঢেলেছি। গাছের শিকড় দিয়ে মাটি থেকে সেই পানসে রসকে গাছের ভেতরে টেনে তুলেছি। চিন্তা করে দেখ, এই কাঁঠাল গাছটার ভেতর শুধু কাঠ, চারদিকে কোন ছিদ্র নেই, ছুরাখ নেই। এই স্রেফ কাঠের ভেতরে আমি কোন্ কলের, কোন মিলের চিনি মিশিয়ে, সে পানসে রসকে মিষ্টি সরবত করেছি।

তারপর আমি সেই মিষ্টি সরবতকে উপরে টেনে তুলে কাঁঠালের ভেতরে ঢুকিয়ে কোষগুলোকে মিষ্টি করে দিয়েছি। অতি অলক্ষ্যে থেকে এত কাজ আমাকে করতে হয়েছে শুধু তোমাদের সুখের জন্য। রাতের বেলায় তুমি আরাম করে ঘুমাও কিন্তু আমি আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করে সদা জাগ্রত আছি। আমার আহার নেই, নিদ্রা নেই, ঝিমানি নেই। কাঁঠালের সৃষ্টির শুরু থেকে পাকা পর্যন্ত প্রায় চার-পাঁচ মাস সময় লাগে।

মানুষ তুমি ভেবে দেখ, এ কাঁঠালটা যে শুধু গাছ থেকে কেটে এনে তোমার কাছে বিক্রি করল, তাকে তুমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এই কাঁঠালের মূল্য দিলে কিন্তু কাঁঠাল গাছটি যে সৃষ্টি করল এবং প্রায় চার-পাঁচ মাস তার পেছনে খাটুনি খাটল এবং কাঁঠালের কোষ মুখে দিলে, তোমার জিহ্বায় যে স্বাদ লাগলো, সে স্বাদও যে সৃষ্টি করে দিল তাকে তুমি কি দিলে? তোমার কি একটু সভ্যতাও নেই? একটু শিষ্টাচারও নেই? তাকে তুমি একটা ধন্যবাদও দিলে না। শুধু তুমি খেয়ে পরে উপভোগ করে গেলে কিন্তু কে তোমাকে খাওয়ালো, পরালো, উপভোগ করালো, তাকে কোনদিন একটা মৌখিক ধন্যবাদ দিতেও তুমি জানলে না? তুমি কি তোমাকে মানুষ বলে দাবী করতে পার?"

দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের বেলায় একই নিয়ম, যার নিকট থেকে আম, জাম, কাঠাল, তরিতরকারী ইত্যাদি জিনিস কেনো, তাকে এত কষ্টের পয়সা দাও কিন্তু যে এগুলো সৃষ্টি করলো, তাকে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে একটা ধন্যবাদও দিলে না?

এটা একটা মোটা জ্ঞানের কথা যে বাজার থেকে একটি টেবিল কিনে নিয়ে আসলে, যে কুলিটি মাথায় করে টেবিলটি তোমার বাড়ীতে এনে দিল, যে মিস্ত্রী এই টেবিলটি বানিয়েছিল, তাকে অবশ্যই ঐ কুলির চেয়ে অনেক বেশী মূল্য দিয়েছ। কিন্তু কাঁঠালটি তোমাকে যে বয়ে নিয়ে দিল, তাকে তুমি যে মূল্য দিলে কাঁঠাল যে সৃষ্টি করেছিল, তাকে অবশ্যই এর চেয়ে বেশী মূল্য দেয়া উচিৎ ছিল। এ রকম প্রত্যেকটি জিনিসের উপভোগ করার বেলায় তোমার কি দায়িত্ব রয়ে গেল, এ সম্বন্ধে তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন প্রশ্ন করা হবে না বলে কি তুমি মনে কর?

তোমার জীবন এবং তোমার জীবন ধারণের সর্বপ্রকারের উপকরণ তথা যাবতীয় শস্যপাতি, কাঠ, লাকড়ি আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, তোমার সর্বদেহ, এমনকি তোমার চোখের মনি, যেটা দিয়ে এই মুহূর্তে বইটি পড়ছ, এর সবই সূর্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সবার উপরে বড় কথা হল, এই যারা নামাজ পড়ে না, যারা জিকির করে না, অর্থাৎ আল্লাহ্র দেয়া সুখের সংসারে বিভোর হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে একেবারেই অবিশ্বাসের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেছ, তারা একটা কথার জবাব দিয়ে অন্ধকার কবরে পা নামিয়ে দিও।

প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে লাকড়ি সূর্যের মধ্যে ঠেলে কে এই সূর্যকে সদা প্রজ্বলিত এবং উত্তপ্ত রেখেছে? সেটি তোমরা (অবিশ্বাসীরা) না আমি আল্লাহ্? যদি তোমরা কেউ এই সূর্যের ভেতর লাকড়ি ঠেলে থাক, তাহলে আমি আল্লাহ্ আমাকে স্মরণ করার দরকার নেই। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দরকার নেই। আমার ছুবহান আল্লাহ্, আল্হামদুলিল্লাহ্ এবং নামাজ ইত্যাদিকে দেশ হতে তাড়িয়ে দিও। আমি যদি ওতে (সূর্যে) লাকড়ি ঠেলে থাকি এবং সর্বদা তোমাদের সবার জীবনকে বাঁচিয়ে রেখে থাকি, তাহলে শোন, "ভয়ংকর ঐ আগুন যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর অর্থাৎ নিমকহারাম যারা তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আজাব অপেক্ষা করছে"।

আর একটি কথা না বলে পারা যায় না, মানুষকে সৃষ্টির বেলায় নারী এবং পুরুষ করে যে সৃষ্টি করা হল, এটা কেন হল? বিশ্ব জোড়া শুধু নারী অথবা পুরুষ হতে পারত। যদি তাই হত, তাহলে কেমন হত? এই যে আপনার স্ত্রী আপনার শান্তি, আপনার ক্লান্তি, আপনার

কামনা -বাসনার আশ্রয় স্থল, আপনার সামনে সেজে গুজে ফোটা ফুলের মত এসে দাঁড়ায়, পাতলা ওষ্ঠের কোনায় মধুর হাসির ছটা ঢেউ খেলে যায় এবং নয়ন ভরা স্বপ্নিল ইঙ্গিত বিভাসিত হয়, দু'টি কোমল বাহুতে তার মধুর আলিঙ্গনের বিদ্যুৎ খেলে যায়, তখন আপনি তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে হা করে তাকিয়ে থাকেন। কতইনা ভাল লাগে আপনার বিবির এই সুন্দর মূর্তিটি! সে যেন অপূর্ব একটি শিল্প আর আপনি তার বাকহীন দর্শক। আপনার স্ত্রী শিল্পটির দিকে তাকিয়ে আপনার মনের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, অপূর্ব! কিন্তু ভাববার কথা এই যে, আপনার এই শিল্পটার দিকে তাকিয়ে চিরদিন অবাক হয়ে রইলেন কিন্তু এই অদ্ভুত শিল্পটি কে সৃষ্টি করেছিল, সেই শিল্পীর খবর করলেন না!

এই মুহূর্তে আপনি কেমন করে বেঁচে আছেন?

সূর্যের কিরণ গাছের পাতায় পতিত হওয়ার কারণে গাছের পাতায় গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। গ্লুকোজে গাছ বেঁচে থাকে আর অক্সিজেন গাছ থেকে বের হয়ে যায়। আশ্চর্য কান্ড এই যে, সূর্য তাপ যদি বাতাসকে উলট-পালট না করত, তাহলে অক্সিজেন গাছ থেকে বেরিয়ে বাতাসে এক জায়গায় জমা হয়ে থাকত। বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে, বাতাসের তাপ বৃদ্ধি পেয়ে আবহাওয়া দুষিত হয়ে যেত, ফলে জ ীবনের উপর একটি মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসত।

অক্সিজেন গাছ থেকে বেরিয়ে বাতাসের সাথে মিশে মানুষের নাসিকারন্ধ্র দিয়ে নিঃশ্বাস টানার সময় ভেতরে যায়। এই ভাবে মানবদেহের ভেতরে অত্যন্ত জটিল ক্রিয়া শুরু হয়। অক্সিজেন নাসিকারন্ধ্র দিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে মানুষের বুকে হৃদপিন্ডের দু'পাশে দু'টো ফুসফুসে ঢুকে 'এক একটি ফুসফুসে একশ' কোটি পথ দিয়ে অক্সিজেন ঢুকে। সহজ কথায় প্রতিটি ফুসফুসে একশত কোটি করে দু'টি ফুসফুসে দু'শ কোটি ছাঁকনি (Air bag) এই ছাঁকনি (Air bag) গুলোর প্রত্যেকটি একটি করে কোষ (Cell) দিয়ে তৈরি।

এই কোষে যখন অক্সিজেন ঢোকে, এ ছাঁকনিগুলো অক্সিজেন বাতাস থেকে ছেঁকে রক্তের ভেতর মিশিয়ে দেয়। এই অক্সিজেন মিশানো শোধিত রক্ত তখন হৃৎপিন্ডের দিকে ধাবিত হয়। হৃদপিন্ডের চারটি কোঠা আছে এবং মাইট্রাল ভাল্ব দ্বারা এই চারটি কোঠায় রক্ত চলাচল করে। এতে করে হৃদপিন্ডের ক্রিয়া ঠিক থাকে এবং দেহ জীবন্ত থাকে সদানিয়ত ঘুমে কি জাগরণে, অফিসে কি ক্ষেতে খামারে, শূন্যে কি রান্নাঘরে, পথে কি ঘাটে, ঘরে কি মাঠে।

অক্সিজেন শোধিত রক্ত হৃদপিন্ডের বাম দিকের উপরের কোঠায় অর্থাৎ বাম অলিন্দে (Autrium) প্রবেশ করে মাইট্রাল ভাল্বের সরু মাথা দিয়ে নির্গত হয়ে নিচের দিকে বাম নিলয়ে (Ventricle) গিয়ে পৌঁছে। বাম নিলয় তখন সংকুচিত হয়ে প্রধান ধমনীর (Aorta)

মারফতে সমগ্র দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা ধাক্কা দিয়ে রক্তকে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ বাম নিলয়ের ধাক্কার চোটে হাতের আঙ্গুলের মাথায়, চোখের মনিতে, পায়ের আঙ্গুলের মাথায়, মগজের চিন্তাশক্তির কেন্দ্রে, চুলের গোড়ায় অর্থাৎ মানুষের দেহের ত্রিশ কোটি কোটি কোষের নাগালের ভেতরে পৌঁছে দেয়।

যদি রক্ত এভাবে দেহের প্রত্যেকটা কোষে কোষে না পৌঁছত, তাহলে দেহটা নিশ্চল হয়ে যেত। এই যে রক্ত সমস্ত শরীর জুড়ে চলাচল করে, এটা একটা জিনিসের দ্বারাই মাত্র সম্ভব হয়। সে মহামূল্যবান জিনিসটি হচ্ছে অক্সিজেন। অক্সিজেন রক্তে না মিশলে কি হত? রক্তের ভিতরে তিন প্রকার কণিকা আছে, একটি লোহিত কণিকা আর একটি শ্বেত বা শুভ্র কণিকা এবং অপরটি অনুচক্রিকা। এইসব কণিকা তরল পদার্থের সাথে মিশে সারা দেহে চলাচল করে, ফলে দেহ জীবন্ত থাকে। রক্তে অক্সিজেন না মিশলে সমস্ত কণিকাগুলো জমাট হয়ে দানা বেঁধে যেত এবং হৃদপিন্ডের মাইট্রাল ভাল্বের মুখ বন্ধ হয়ে যেত এবং রক্ত হৃদপিন্ডের এক কোঠা হতে অন্য কোঠায় এ ভাল্ব দিয়ে চলাচল করতে পারত না। ফলে, হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করতে করতে মারা যেত।

মানবদেহের বক্ষস্থলের বাম দিকে একটা গোস্তপিন্ড আছে যাকে হৃদপিন্ড বলে। এটা বটপাতার মত দেখতে এবং বাম দিকে একটু কাত হয়ে থাকে। এটাই প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনকে জীবন্ত করে গতিশীল করে রেখেছে। হৃদপিন্ড অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে এবং দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তকে সঞ্চালিত করে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখছে। হৃদপিন্ড যদি স্পন্দিত না হত, তবে দেহে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে মানুষ চোখের পলকে মরে যেত।

যারা স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করে, তারা কোনদিন কি ভেবে দেখেছে একটি ভাবনার কথা? ভাবনাটা ভেবে বিজ্ঞানীরা মাথা হেঁট করে বলেছে, নিশ্চয়ই আছেন একজন। ভাবনাটা হচ্ছে, হৃদপিন্ড সৃষ্টি হবার পর নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকল, নিস্তেজ হয়ে রইল। কারণ, এটা হচ্ছে একটা জড় পদার্থ, একটা মাংসপিন্ড, এর নিজের নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। আগেই বলা হয়েছে, বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, জড় পদার্থে গতি সৃষ্টি করে না দিলে তা গতিসম্পন্ন হয় না এবং যতক্ষণ গতিসৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই এটা গতিসম্পন্ন থাকে। এবারে বিজ্ঞানীরা ভেবে কূল পেল না, এই যে, হৃদপিন্ডটা অনবরত স্পন্দিত হয়ে মানুষের জীবনের আসল কারণরূপে কাজ করে যাচ্ছে, এই হৃদপিন্ডকে প্রথমে কে একটা ধাক্কা দিয়ে গতিসঞ্চার করে দিল? যিনি প্রথম ধাক্কা দিয়ে হৃদপিন্ডে গতি সঞ্চার করে দিলেন, তিনি হচ্ছেন সেই মহাস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন।

দেহতত্ত্ববিদগণ মানবদেহ জরীপ করতে গিয়ে অসংখ্য স্থানে মহাস্রষ্টা আল্লাহ্কে মেনে নিয়েছেন। যিনি হৃদপিন্ডে স্পন্দন দিয়েছেন, যিনি প্রথম ধাক্কা দিয়ে হৃদপিন্ডকে স্টার্ট করিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি ভ্যাগাস নার্ভে জীবনপ্রবাহের প্রেরণা দিয়ে (Impulse) ইনজে

কশন দিচ্ছেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে জানিয়ে দিয়েছেন, *"আল্লাহু নুরুছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ"* (আল কুর'আন)- অর্থাৎ আসমান জমিনে যা কিছু প্রেরণা পায়, শক্তি পায়, হৃদপিন্ড তার চলচ্ছক্তি পায়, ভ্যাগাস নার্ভ প্রবাহ পায়, জীবকোষ তার শক্তি পায় এর একমাত্র কারণ এসবের জেনারেটর হচ্ছি "আমি"। আমি মহাআলো, মহাতেজোময় শক্তি। আমার মহাশক্তির মেশিন থেকে সবাই শক্তি (Energy) পায়। আমার আলো বিদ্যুতের প্রবাহের মত মস্তিষ্কে খেলে যায় অনবরত, তা থেকে ভ্যাগাস নার্ভ প্রবাহ পায়। সেই তড়িৎ প্রবাহ প্রতিনিয়ত ও হৃদপিন্ডকে উজ্জীবিত করে এবং অনবরত তার স্পন্দন শক্তি যোগায়। এজন্য প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্ অনুধাবন করে দেখতে বলেছেন, *"আফালা তা'কিলুন"* অর্থাৎ তোমাদের কি জ্ঞান নেই, তোমরা কি একেবারেই পাথরের চেয়ে স্থবির হয়ে চিন্তা কর?

তোমার সামনে একখন্ড গোশ্‌ত খাবারের পেয়ালায় রাখা হল। এখন তুমি ওতে হাত দিতে যাবে, এমন সময় যদি ঐ গোস্তপিন্ডটি হঠাৎ স্পন্দিত হয়ে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হতে থাকে তার ভেতর থেকে ঝোলগুলো উথলিয়ে ওঠে এবং ওঠানামা করতে থাকে, প্রতি মিনিটে আশিবার, তবে তুমি নিশ্চয়ই লাফ দিয়ে উঠবে, ভাবনায় বিভোর হয়ে চিল্লাচিল্লি করে পড়শীকে হাঁকাহাঁকি করে ডাকতে শুরু করবে। কিন্তু তোমার ভেতরে মিনিটে সত্তর থেকে আশি বার তোমার নিজের গোস্তখন্ডটা যে লাফাচ্ছে, তার শব্দ তুমি স্টেথিসকোপে কানে শুনতে পাও? কই, তুমি ত জীবনে কোনদিন এর জন্য তোমার জ্ঞানী পড়শীকে ডেকে এর কারণটা জিজ্ঞেস করলে না বা ভুলেও একদিন চিন্তা করে দেখলে না এই প্রাণহীন পদার্থটি একটি জীবন্ত প্রাণীর মত কেন লাফায়? এই মর্মে আল্লাহ বলেন, *"উলাইকা কাল আনআম বালহুম আদাল"* (আল্ কুর'আন)- অর্থাৎ এত নিকটের চিন্তাভাবনা যার নেই, ভেতরের খবর নেই, বাইরের কত কিছু নিয়ে কতই না ভাবনা ভাবে, এরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

অক্সিজেনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, সেটি হল, শর্করা জাতীয় (চিনি জাতীয়) খাদ্যের সঙ্গে বিক্রিয়া (মিশে) করে শক্তি সৃষ্টি করে। যদি অক্সিজেন দেহে প্রবেশ না করত, তবে মানুষ সব বলহীন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ত। তার অফিসে যাওয়ার ক্ষমতা থাকত না, প্রিয়জনের মুখখানার দিকে চেয়ে দেখার শক্তি থাকত না, ফাগুনের কোকিলকণ্ঠ তাকে ভাবুক করে তুলত না, অফিসে দস্তখত দিয়ে মাইনে পাওয়া চলত না, কৃষকের হাতে আর লাঙ্গল জোয়াল উঠত না, চাঁদনী শুভ্রা যামিনী তার কাছে ঘোর অন্ধকার রাত বলে মনে হ'ত। এক কথায় এত আনন্দের জীবন এত সুখের সংসার, সবই ধূসর মরুভূমি বলে মনে হ'ত।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই মুহূর্তে আপনি যেভাবে বসে আছেন তা যদি নিজের শক্তিতে সম্ভব হয়েছে বলে যদি বিশ্বাস করেন, তাহলে মস্তবড় ভুল হবে। আসলে আপনি আপনার নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে বেঁচে নেই

এবং আসলে আপনি এখন এখানেও নেই। আপনি সর্বতোভাবে সূর্যের শক্তির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। কারণ আপনার নিঃশ্বাস, আপনার হৃদপিন্ড, আপনার রক্ত চলাচল সবই সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আসলে আপনি ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছেন এবং আপনার দেহটি পরোক্ষভাবে সূর্যের শরীরে লটকিয়ে আছে। আপনি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন না বরং আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তাই মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সদা জীবিত রেখেছেন, তিনি বলেন, "তুমি কি একাই চল, না কেউ তোমাকে চালায়?" (আল কুর'আন)। তিনি আরও বলেন, "কিসে তোমাকে (হে মানুষ) তোমার দয়ালু সৃষ্টিকর্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল?

কেমন করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হল?

মহাবিশ্বে এই যে, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের সমন্বয়ে যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, সংক্ষেপে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে কয়েকটি মতবাদ আলোচনা করা হল ঃ

১। **নীহারিকাবাদ তত্ত্ব** (Nebular Hypothesis) ঃ এই মতবাদ অনুসারে আদিতে বিশ্বের মহাশূন্যব্যাপী একটা দীপ্তমান বাষ্প পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই উত্তপ্ত বাষ্প যুগ যুগান্তর ধরে তাপ বিকিরণ করে ক্রমে ক্রমে ঠান্ডা হতে হতে পানির কণা হয়ে জমতে থাকে। ফুটন্ত বাষ্প যেমন তাপ ছড়িয়ে জমে পানির আকার নেয়, তেমনি মহা বিশ্বব্যাপী উত্তপ্ত বাষ্প তাপ ছড়িয়ে ঠান্ডা হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়া টুকরোগুলোই নীহারিকার সৃষ্টি করে। এক একটি টুকরো থেকে একটি করে নীহারিকার সৃষ্টি হয়।

নীহারিকাগুলো বহু যুগ ধরে যখন ঠান্ডা ঘন হতে থাকল, তখন তাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রচন্ড এক চাপের সৃষ্টি হল। ঘুরতে ঘুরতে নীহারিকার বস্তুপুঞ্জের মধ্যে বহির্মুখী এক তীব্র শক্তি (Centrifugal force) সৃষ্টি হল। নীহারিকাগুলো প্রচন্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে যখন একটা বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন তাদের গা থেকে জ্বলন্ত বাষ্পের টুকরাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকল। সেসব টুকরো থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রগুলো। ছিটকে পড়ার সময় নক্ষত্রগুলো যে বিপুল গতি এবং বেগ পেয়েছিল, সেই গতিবেগেই আজও তারা মহাকাশের বুকে ছুটে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘ দিনের বা কালের বিবর্তন, আবর্তনে স্মরণাতীত কালে এই সব নক্ষত্র এবং নীহারিকা সৃষ্টির মূলে আসলে যে কি ঘটনা ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা রয়েছে। তারা স্বীকার করেছেন, ভাঙ্গার পূর্বে নীহারিকার যে আকার হতে পারে, সে আকারের অনেক নীহারিকা দূরবীণে ধরা পড়ছে। এর থেকে মাঝে ভাঙ্গার অবস্থাটা শুধু আঁচ করে মতবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

২। **বিরাট বিস্ফোরণ তত্ত্ব** (Big bang) বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, প্রায় এক হাজার কোটি, মতান্তরে দু'হাজার কোটি বছর পূর্বে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই সময় মহাবিশ্বগুলো একত্রিত হয়ে অতি ঘন, অতি ক্ষুদ্র মহাঅগ্নির একটা বিন্দুর আকারে ছিল। এই বিন্দুর আকার এত ক্ষুদ্র ছিল যে কল্পনায় তা আনা যায় না। এই অতি ঘন, অতি ক্ষুদ্র মহাঅগ্নিকুন্ডের একা একা বিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণের সময় মহাঅগ্নিকুন্ডময় বিন্দুর মহাকর্ষবল, বিদ্যুৎ চুম্বক বল, প্রবল কেন্দ্রকোণীয় বল ও দুর্বল কেন্দ্রকোণীয় বল এই চারটি মৌলিক বল একত্রীভূত ছিল।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিস্ফোরণের তিন মিনিটের মধ্যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। এই বিস্ফোরণের তিন মিনিটে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডে(প্লাংকের সময়) অর্থাৎ এক সেকেন্ডের দশ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময় পরে মহাকর্ষ বল অন্য তিনটি বল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সময় মহাবিশ্বের ব্যাস ছিল মাত্র $১০^{-২৮}$ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের এক কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ, তাপমাত্রা ছিল $১০^{-৩২}$ অর্থাৎ দশ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি কেলভিন এবং ভর ছিল $১০^{৪৬}$ টনের কয়েক গুণ অর্থাৎ দশ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি টনের কয়েক গুণ। উল্লেখ থাকে, দুই ইঞ্চি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার প্রায়।

বিস্ফোরণের পর ফোটন বা আলোক কণা সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্বের বিস্তৃতি দ্বারা এই সমস্ত ফোটনের লোহিত অপসারণ ঘটে এবং তা বর্তমানে বেতার তরঙ্গ (Radio Wave) রূপে পাওয়া যায়। বিশ্বের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এর তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডে অর্থাৎ এক সেকেন্ডের এক কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময় পরে বিশ্বের ব্যাস হয় ১০^{-14} সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের এক হাজার কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ কোটি সেন্টিমিটারে এক ভাগে তাপমাত্রা হয়েছিল $১০^{-২৮}$ K অর্থাৎ এক কোটি কোটি কোটি কোটি কেলভিন। এই সময় তেজ জমাট বেঁধে পদার্থে পরিণত হতে থাকে। কোয়ার্ক, ইলেকট্রন ও তাদের প্রতিবিম্ব, প্রভৃতি পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং বিশ্ব একটা নরম বলের আকার ধারণ করে।

এইভাবে তাপ বিকিরণ এবং প্রসারণের ফলে $১০^{-৬}$ সেকেন্ডে অর্থাৎ এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে বিশ্ব প্রায় সৌরজগতের আকার ধারণ করে অর্থাৎ সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহ দিয়ে যতখানি জায়গা জুড়ে আছে তার পরিমাণ। এই নিম্ন তাপমাত্রায় কোয়ার্ক হয়ে প্রোটোন এবং নিউট্রন সৃষ্টি হয়। পদার্থ এবং অতি পদার্থ পরস্পরকে ধ্বংস করে। ফলে, কিছু অতিরিক্ত পদার্থ বেশী ছিল, সেই অতিরিক্ত পদার্থ থেকে বর্তমান বিশ্বের সৃষ্টি। এই সময় বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল একশ' কোটি ডিগ্রী কেলভিন। এই সময়ই প্রোটন ও নিউট্রন মিলে নিউক্লিয়াস গঠন করে। এইভাবে এক লক্ষ বছর পরে কেন্দ্রকণার (নিউক্লিয়াসের) সাথে ইলেকট্রন যুক্ত

হয়ে পরমাণু গঠন করে পরমাণুর গঠন অর্থাৎ অস্তিত্বের সৃষ্টি। পদার্থ থেকে বিকিরণ পৃথক হয়ে আলো মহাশূন্যে চলতে আরম্ভ করে। এইভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়।

৩। **স্থিতাবস্থা বা অবিরাম সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ** ১৯৪৮ সনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ বন্দি টি গোল্ড এবং এফ হোয়েল এই মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদে বলা হয়েছে, বিশ্বের কোন পরিবর্তন হয়নি। এটা আদিতে যেমন ছিল, বর্তমানে তাই আছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। এদের মতে, মহাশূন্যে হাইড্রোজেন আকারে নিরবচ্ছিন্ন বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্ব অনবরত সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে যে শূন্য বা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হচ্ছে, হাইড্রোজেন দ্বারা যে বস্তুপুঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে তাই নব নব ছায়াপথের সৃষ্টি করে চলছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে করেননি।

৪। **পৌনঃপুনিক বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব** (Theory of Oscillation) ঃ এই মতবাদে বলা হয়েছে, মহাবিশ্বের কোন আদি বা অন্ত নেই। এই তত্ত্বে আরও বলা হয়েছে, অনন্তকাল ধরে মহাবিশ্ব একই পর্যায়ে থাকে না। এইসব বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান সম্প্রসারণশীল বিশ্ব এক বিরাট বিস্ফোরণের কারণে সম্প্রসারিত হওয়া শুরু করে কিন্তু মহাকালের পরিক্রমায় এই সম্প্রসারণ ক্রমশঃ স্থবির হয়ে আসবে এবং ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকবে।

এইভাবে মহাবিশ্ব মহাকালের কোন এক সময় ধ্বংসে পড়বে। এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব আবার কোন এক সময় কল্পনাতীত ঘন, ক্ষুদ্র, উত্তপ্ত অগ্নিবলয়ে পর্যবসিত হবে। এরপর পুনরায় মহাবিস্ফোরণের সৃষ্টি হবে এবং আবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। বিশ্ব ধ্বংস এবং সৃষ্টির মধ্যে দোলায়মান থাকবে।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সব মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হল, এগুলো সবই আনুমানিক। মহাবিশ্ব সৃষ্টির কাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যে ধারণা পোষণ করেছেন তাও আনুমানিক। কেউ বলেছেন, এক হাজার কোটি বছর যাবৎ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন , না, দু'হাজার কোটি বছর যাবৎ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির সময় কালটাই তারা সঠিক করে বলতে পারেননি। এক হাজার কোটি বছর ব্যবধান কি চারটিখানি কথা? মহাবিশ্ব সৃষ্টিকাল সম্বন্ধেই যদি ধারণা এত আনুমানিক হয়, তবে তাদের সৃষ্টিতত্ত্বটা আজকের এই দিনে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেমন করে সত্য হতে পারে? এজন্য বিজ্ঞানীরা সবাই বলেছেন, সৃষ্টিতত্ত্বের মতবাদগুলো সবই আনুমানিক এবং মহাবিশ্বের বর্তমান আচার আচরণ দেখে, গ্রহ-নক্ষত্র এবং বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে মতবাদ (Theory) গুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। এইগুলো যদি একেবারেই অভ্রান্ত হত, তাহলে যুগে যুগে মতবাদ (Theory) গুলো একটার পর একটা বাতিল হত না। এসব জ্ঞানীজনের ভেবে দেখার কথা।

যেমন- নীহারিকাবাদ তত্ত্ব (Nebular Hypothesis) এক সময় বিজ্ঞান জগতে অনেক আলোড়ন তুলেছিল। বর্তমানে অন্যান্য মতবাদের মধ্যে বিরাট বিস্ফোরণ মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিজ্ঞানীরা মত পোষণ করেছেন। এই মতবাদে বলা হয়েছে, প্রায় এক হাজার, মতান্তরে প্রায় দু'হাজার কোটি বছর পূর্বে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই সময় একটি অতি ঘন অতি ক্ষুদ্র মহাঅগ্নিকান্ডের একা একা বিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষুদ্রতম কণার ব্যাস ছিল ১০$^{-২৮}$ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের এক কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। এ থেকে বলা যায় যে, এর আয়তন এত ছোট ছিল যে, জড় চক্ষুতে দেখা তো দূরের কথা, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এমনকি কল্পনায়ও ধরা পড়ে না।

মতবাদটিতে আরও বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্রপিন্ডটির একা একা বিস্ফোরণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়। এ থেকে আরও একটি সমূহ ধারণা পাওয়া যায় যে, পবিত্র কুর'আন পাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন, *"কুন ফাইয়াকুন"* অর্থাৎ "আমি (আল্লাহ্) বলেছি, হয়ে যাও। তাই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে," এই কথারই প্রতিধ্বনি। **বিজ্ঞান আজও শিশু, তার দুধের দাঁত পড়েনি। বিজ্ঞান যদি আরও তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে, তবে মহাস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।**

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি ঘটনার পেছনে একটা কারণ আছে। এই বিন্দুটির একা একা মহা বিস্ফোরণ হওয়ার পেছনে যে কারণটি ছিল, সে কারণটি হচ্ছে আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিনের আদেশ (Order) যাকে 'কুন' বলা হয়েছে। বিরাট বিস্ফোরণ (Big Bang) বিশ্লেষণ করতে করতে এই মতবাদের ক্রটি একদিন ধরা পড়বে এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টির আসল তত্ত্বটি একদিন আবিষ্কৃত করে বলবে, মহাবিশ্বের মহাসৃষ্টির পেছনে একটা মতবাদ (Theory) রয়েছে সে মতবাদটি হচ্ছে, 'হও' এবং হয়ে যায়। এই মতবাদটির কথা কুর'আন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন কোন জিনিস আমি বলি 'হও' তখন তা নিঃশর্তভাবে হয়ে যায়। বিজ্ঞান শুধু ঘটনা বিশ্লেষণ করে থাকে, ঘটনার কারণ তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূলে একটা মহা বিস্ফোরণ হয়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু কেন বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং কে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা কোনদিন দিতে পারেনি।

৪র্থ অধ্যায়

মহাবিশ্বের আরেকটি মহাবিস্ময়- মানুষ

মানুষ একটি মহাবিস্ময়কর সৃষ্টি, যার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। হৃদপিন্ড, মহাস্রষ্টার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। এই হৃদপিন্ড সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এটা শুধু একখন্ড জড় গোস্তখন্ড। এটা কিভাবে প্রথম স্টার্ট করা হ'ল এবং কিভাবে প্রতিনিয়ত সে প্রতি সেকেন্ডে সত্তর থেকে আশিবার স্পন্দিত অর্থাৎ সংকুচিত এবং প্রসারিত হচ্ছে, তা বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারেননি।

অধুনা খুলুক তুর্কী নামে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হৃদপিন্ডের ভেতরে একটি আশ্চর্য জিনিষ আবিষ্কার করেছেন, যে আবিষ্কার বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীদের এবং নাস্তিকদের মাথা দারুণভাবে হেঁট করে দিয়েছেন। তিনি হৃদপিন্ড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে তার ভেতর একটা চার অক্ষরের আশ্চর্য নকশা দেখতে পেলেন। নকশাটি সৌদির একটি পত্রিকা থেকে হুবহু ছেপে দেয়া হলোঃ

বলা বাহুল্য এটিই আল্লাহ্ নামের নকশা। এ নকশা আকারেই এবং (   ) চারিটি অক্ষর দ্বারা আল্লাহ্র নাম লেখা হয়।

মস্তিষ্ক

মানুষের মাথা এবং মাথার মগজটি একটি আশ্চর্য এবং অবোধ্য জিনিস যার কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক আজও কোন সঠিক ধারণা দিতে পারেননি। মাথার মগজে রয়েছে অসংখ্য কোঠা বা কক্ষ, যেগুলো মানুষের সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক সম্পর্কে গবেষণা করে বলেছেন, মগজের ভেতর রয়েছে দশ লক্ষ স্নায়ুকক্ষ (Nerve Cells) যার প্রত্যেক কক্ষ থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মিহি সূতার চেয়েও চিকন তন্ত্রী বের হয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই তন্ত্রীর মধ্য দিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে সংবাদ গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদানের ব্যবস্থা সংঘটিত হয়ে থাকে। এভাবে প্রত্যেকটি কক্ষের ভেতর অচিন্তনীয় শক্তি নিহিত রয়েছে। মগজের ভেতর একচেঞ্জ (Exchange Centre) সেন্টার বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ কক্ষ রয়েছে, যার ভেতরে কার্যাদি সম্পন্ন করতে এত যন্ত্রপাতি লাগে যে, সেগুলো যদি কোথাও কোন স্থানে স্থাপন করা যেত, তাহলে তার আয়তন এতই বড় হত যে, আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মত ছ'টি বিল্ডিং-এর প্রয়োজন হত এবং একচেঞ্জ সেন্টারের ক্যাবলগুলোর

হৃপিন্ডের নক্শা এবং তার মধ্যে আরবীতে আল্লাহ্‌র নামের নক্শা


اكتشاف عجز عنه العلم حتى الساعة

اسم "الله" فوق جزء من قلب الانسان

vesikalar konuşuyor

SCIENCE DIGEST

Réalités

শরিয়তে ছবি ছাপা নিষিদ্ধ বিধায়- বৈজ্ঞানিকের ছবি প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

লেখক

ওজন হত কয়েকশ'টন। বলা বাহুল্য, বিল্ডিংটি একশো একতলা এবং কয়েক বছর পূর্বে এটাই ছিল জগতের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং। মগজের ভেতর এই যন্ত্রগুলো যখন অতি দ্রুত কাজ করতে থাকে তখন তারা ভীষণ উত্তপ্ত হয়, এই উত্তপ্ত যন্ত্রপাতিগুলোকে ঠান্ডা করার জন্য পদ্মা নদীর মত কয়েকটি নদীর পানি ঢাললে তা ঠান্ডা রাখা যেত। মহাশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই একচেঞ্জ সেন্টারটি মগজের ভেতরে অতি সামান্য জায়গা জুড়ে আছে।

মানুষের মাথার মগজ যে কি জিনিস এবং উহা কিভাবে কর্মক্ষম হয়ে দেহকে পরিচালনা করে তা আজও কোন বৈজ্ঞানিক সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ মস্তিষ্ক সম্পর্কে আরো একটি আশ্চর্য খবর জানিয়েছেন যে, সাধারণ মানুষের মাথার মগজের যে কোষ গুলো আছে তার শতকরা দু' থেকে তিন ভাগ মাত্র সক্রিয় থাকায় মানুষেরা খাওয়া দাওয়া, চলাফেলা, জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেক বিবেচনা ইত্যাদি কাজ করে থাকে বাকী ৯৭% থেকে ৯৮% ভাগই সুপ্ত (Dorment) অবস্থায় থাকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, পড়াশুনা বিভিন্ন বাহ্যিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ তার মস্তিষ্কের সুপ্তকোষের সর্বাধিক শতকরা আট থেকে নয় ভাগ মাত্র কর্মক্ষম করে তুলতে পারে। বাকী সব গুলোই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। মস্তিষ্কের কারিগরী কলাকৌশলগুলো যদি কম্পিউটার মেশিন দ্বারা স্থাপন করা যেতো তাহলে এই পৃথিবীর পুরো স্থানটুকুই সেই কম্পিউটার মেশিন বসাতে লেগে যেতো। যদি মস্তিষ্কের ১০০ ভাগই কার্যকর থাকতো তাহলে সেই কম্পিউটার মেশিন বসাতে ৪৮টি পৃথিবীর সমান জায়গা লাগতো। মস্তিষ্কের মগজের এই অতি সামান্য জায়গায় দশ লক্ষ কোঠাবাড়ী এবং এতবড় একটি কম্‌পিউটারাইজড্ একচেঞ্জ সেন্টার কোন মহা ইঞ্জিনিয়ার সৃষ্টি করল জ্ঞানীজনের তা কি একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল না? এসব কি একা একাই সৃষ্টি হয়েছে?

মস্তিষ্কের চক্ষু

বিজ্ঞানীগণ আমাদের 'মস্তিষ্কের চক্ষু'র সন্ধান পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্টিফেন কসলীন ও তাঁর সহকর্মীরা 'মস্তিষ্কের চক্ষু' প্রাপ্তি সংক্রান্ত তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্য সম্প্রতি বিখ্যাত 'বিজ্ঞান সাময়িকী' 'নেচার'-এ প্রকাশ করেছেন। এসব মার্কিন বিজ্ঞানী ১২ জন স্বেচ্ছাসেবীর মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অনুধাবনের জন্য পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি স্ক্যান ব্যবহার করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, যখন কোন বস্তু চোখের কাছাকাছি আসে তখন মস্তিষ্কের পেছনের ধূরস বাহ্যাংশ তথা 'ভিসুয়েল করটেক্স' সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তখন সেই বস্তুর ছবিটি দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা তাঁদের স্বেচ্ছাসেবীদের কম্পিউটারে ভেসে আসা সাধারণ কিছু ছবি মনে রাখতে বলেন। এসব স্বেচ্ছাসেবীর প্রাইমারী ভিসুয়েল করটেক্সের যে পরিবর্তন আসে তা তাঁরা অন্য আর এক দল চক্ষু বাঁধা স্বেচ্ছাসেবীর প্রাইমারী ভিসুয়েল করটেক্সের সাথে তুলনা করেন। তারা লক্ষ্য করেন, যাদের চোখ বাঁধা ছিল তারা কম্পিউটারের ছবি দেখতে পাননি এবং কোন প্রতিবিম্ব কল্পনা করতে পারেননি। বিজ্ঞানীদের

পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি স্ক্যানিং থেকে দেখা যায়, যখন কোন সাধারণ ছবি কল্পনা করা হয় তখন মস্তিষ্কের পেছনের ভিসুয়েল করটেক্স তৎপর হয়ে উঠে, কিন্তু কোন বড় ছবির কথা কল্পনা করতে মস্তিষ্কের সামনের অংশ তৎপর হয় মধ্য আকারের ছবির বেলায় মস্তিষ্কের মাঝামাঝি অংশ কাজ করে।

চক্ষু, কর্ণ

মানুষের দেহে চক্ষু একটি আশ্চর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের একটি বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি এই চক্ষু যার ভেতর প্রায় দশটি ভাগ রয়েছে এবং একটি চক্ষুর ভেতরে তের কোটি আলোক গ্রাহক (Light Receptor) রয়েছে। এগুলো মানুষের মস্তিষ্কে সারি সারি ছবি পাঠায়। এটা খুবই ভাববার বিষয় যে, এই আলোক গ্রাহকগুলো চোখের ভেতর বসে মানুষের চোখের দৃষ্টি ঠিক রেখেছে।

এভাবে কানের ভেতরে রয়েছে প্রায় এক লক্ষ শ্রবণ কোষ। এ শ্রবণ কোষগুলোই মস্তিষ্কে শব্দ প্রেরণ করে এবং শ্রবণ কার্য সম্পন্ন হয়। মানুষের জিহ্বায় রয়েছে তিন হাজ ার স্বাদ আস্বাদন কক্ষ (Test Bud)। মানুষ যাতে টক, মিষ্টি, ঝাল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের স্বাদ ঠিকমত অনুভব করতে পারে। সেজন্য জিহ্বার ভেতরে তিন হাজার কর্মচারীকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র একটি আশ্চর্য কারখানা পাকস্থলী। খাদ্য পাকস্থলীতে যাবার পর সেগুলো ঢেকিতে কুটার মত কুটতে থাকে। পাকস্থলীর ভেতর অসংখ্য তার জালকের মত পাকস্থলী ছেয়ে আছে। এই জালক হতে কয়েক প্রকার রস বা এনজাইম (Engyme) বের হয়ে খাদ্যকে হজম করে। যে রসগুলোর ভেতর হাইড্রোক্লোরিক (HCl) এসিড, পেপসিন, মিউসিন প্রধান। ঐ তারের মত জালক থেকে রসগুলো বেরিয়ে খাদ্যের সাথে না মিশলে খাদ্য কিছুতেই হজম হত না। মানুষ পেট ফুলে মরে যেত। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন, পাকস্থলীর যে জালকগুলো বা তারগুলো হতে এই রস নিঃসরণ হয়, তাদের সংখ্যা হচ্ছে তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ।

মানব দেহের আরেকটি আশ্চর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে বৃক্ক (Kidney)। দেহের ভেতর পানির সাম্যতা রক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেহ থেকে বের করে দেয়াই এর প্রধান কাজ। মধ্যচ্ছদার ঠিক নিচেই দু'পাশে দুটো কিডনি রয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, প্রতিটি বৃক্কে দশ লক্ষ করে দুটো বৃক্কে সর্বমোট বিশ লক্ষ মুত্রগ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলো রক্ত এবং পানিকে ছেঁকে পৃথক করে দেহের অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেহ থেকে বের করে দেয়।

পিলে (Spleen) মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই পিলে প্রতি সেকেন্ডে এক কোটি রক্ত কণাকে ধ্বংস করে। যকৃৎও তাই করে অর্থাৎ যকৃৎ ও পিলে মিলে প্রতি সেকেন্ডে দু'কোটি রক্ত কণাকে ধ্বংস করে। অবশ্য হাড়ের মজ্জায় আবার কণাগুলো সৃষ্টি হয়। অলক্ষ্য থেকে কে এই ভাঙ্গা গড়ার কাজ করে মানুষকে সর্বদা জিইয়ে রাখে!

মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত মানুষটা জালের মত রগ দিয়ে ছাওয়া। এই রগগুলোকে একত্রে জোড়া দিয়ে লম্বা করলে এদের দৈর্ঘ্য হয় বার হাজার মাইল। সাড়ে তিন হাত একটা মানুষের ভেতরে এতবড় একটা লম্বা তার কি সুনিপুণভাবে যে আঁকা বাঁকা করে ছোট করা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। এটা কি একাই হওয়া সম্ভব?

আর একটা আশ্চর্য বিষয় মানুষের চর্ম। এই চর্ম শুধু মানব দেহের আবরণ নয়, এটা মানুষের অনুভূতিরও প্রধান মাধ্যম। মানুষের চামড়ায় জালের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্ত্র দিয়ে ছাওয়া। চামড়ায় আনুমানিক ত্রিশ হাজার উষ্ণ কোষ আছে, যা কোন গরম বস্তু চামড়ার সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে তা আঁচ করে খুব তাড়াতাড়ি মস্তিষ্কে খবর পাঠায় এবং মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ লক্ষ মাংস গ্রন্থিকে এক ধরনের শীতল রস বের করে উক্ত স্থানে যাবার নির্দেশ দেয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে কাজটি সমাধান হয়। আবার একই রূপে চামড়ার দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শীতল কক্ষ রয়েছে, যারা শরীরের কোথাও বেশী শীত অনুভব করার সাথে সাথে মস্তিষ্কে খবর পাঠায়। তখন দেহ কাঁপতে থাকে। চামড়ার শিরা উপশিরাগুলো এলিয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ উষ্ণ রক্তকে শীতল জায়গায় যাবার নির্দেশ দেয় এবং এভাবে ঠাণ্ডা জায়গাকে গরম রাখে। কি চমৎকার বিধি বিধান! অলক্ষ্য থেকে কে এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে? একটি ভাবার বিষয় এই যে, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যার একজনের চেহারার সাথে আরেক জনের চেহারা মেলে না, একজনের বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ (Thumb Impression) অন্য জনের সাথে মেলে না। এমন কি অস্ত্রপচার করে উপরের চামড়া তুলে দিলেও পরে যে নতুন চামড়ার রেখা সৃষ্টি হয়, সেগুলোও মিলে না। কোটি মানুষের কোটি কোটি আঙ্গুলের ছাপ কেমন করে যে কোটি কোটি রকমের হয়, তা শুধু চিন্তাশীল মানুষদেরই ভাবনার কথা! এই বইতে প্রথমে মহাবিশ্ব ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, মহাবিশ্ব ও তার বিশালতা সম্পর্কে ধারণা করা আমাদের মত ক্ষুদে মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মহাবিশ্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তাও সীমিত। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এর ব্যাপকতা যে আরও বাড়বে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আবার সাড়ে তিনহাত লম্বা একটা মানুষ যার সম্বন্ধে বিজ্ঞান ভিত্তিতে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল, তাতে দেখা গেল, মানুষের ভেতর এতসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত

হয়েছে এবং আরও যে কত অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব রয়েছে তা কল্পনায় আনা সম্ভব নয়। আর মানুষ তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে সমগ্র প্রাণিকুল এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে তার প্রভুত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয়েছে। তাই মানুষ সৃষ্টিকর্তার একটি অতি আশ্চর্য সৃষ্টি বৈকি!!

এই মানুষ এমনি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি যে সম্বন্ধে বিশ্বের কোন দেহবিজ্ঞানী কোন কিছুই সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের মাথার মগজটি যে কি আশ্চর্য জিনিষ এবং সর্বদা এটা কি যে অভিনব এবং অবোধ্যভাবে কাজ করে চলেছে, আজও কোন বিজ্ঞানী তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মার্কিন বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম গ্লেমজার বলেছেন, "একটি পিন মাটিতে পড়ে গেল আপনি উপুড় হয়ে পিনটি মাটি হতে তুললেন, এই মুহূর্তে আপনার মাথাটি যে কি কাজ করল, বিশ্বের কোন দেহবিজ্ঞানী আজও তার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।" এরকম সীমাহীন কাজ রয়েছে যা মানুষের মগজটি অবোধ্যভাবে করে চলেছে। আগেই বলা হয়েছে, মানুষের মস্তিষ্কে দশ লক্ষ কক্ষ রয়েছে। এই দশ লক্ষ কক্ষ মানুষের অজান্তে কাজ সাধন করে। যেমন-প্রেম ভালবাসা, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, বিচ্ছেদ-জ্বালা, সংসারের অজ স্র প্রকার জ্বালাতন, অজস্র প্রকার সুখানুভূতি এবং আরও কত জানা-অজানা অনুভূতি, সীমাহীনভাবে কাজ করে চলছে।

মগজের আরেকটি আশ্চর্য ক্ষমতা যা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে অবাক হয়েছেন, তা হল স্মৃতিশক্তি। একটা ছবি বা অভিজ্ঞতা মগজের স্মৃতিরেখায় কিভাবে যে আটকে থাকে; আশি বছরের বৃদ্ধ পাঁচ বছর বয়সে একটি বাঘ দেখেছিল, জঙ্গলের ভেতরে অথবা একটা মেয়ে আপনার ছাত্র বয়সে কি আচার ব্যবহার করেছিল আপনার সাথে, কি মধুর ভাষায় সম্বোধন করেছিল, আজ চল্লিশ বছর পর অবিকল তা মনে পড়ে, ভুল হয়নি। এমনি কত কোটি কথার মালা, দৃশ্যের আলেখ্য, কথা-কাহিনীর ভিড় মানুষের স্মৃতিপটে অবিকৃত অবস্থায় থাকে, মোটেও মুছে যায় না। ব্রাস বা শিরিষ দিয়ে মাথার খুলি ঘষলেও তবুও মুছে যায় না, বিস্মৃত হয় না। ছবির পর ছবি, কথার পর কথা, কাহিনীর পর কাহিনী কেমন করে মনে থাকে? অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি, আলিফ, বা, তা, ছা থেকে আরম্ভ করে বস্তার পর বস্তা বই পড়ে একটি লোক ডক্টর হয়, দুনিয়া জোড়া নাম করা বিদ্বান হয়। তার এই বস্তাবন্দী বই এর লক্ষ লক্ষ কথা কোথায় আটকে থাকে? ঐ মগজে একটুখানি কোণে সিকি ইঞ্জির ভেতরে। এত শত শত মণ ওজনের পাহাড় পরিমাণ বই-পুস্তক মাথার মগজের ভেতরে কোন দিগন্ত জোড়া আলমারীতে জায়গা হয়?

এছাড়া টেপ রেকর্ডে কথার উপরে আবার কথা টেপ করলে আগের কথা মুছে যায়। কিন্তু মাথার (টেপের) কথা উপরে কোটি কোটি কথা বাজালেও আগের কথা মুছে না। একটা টেপের ক্যাসেট একবারই শুধু এক ধরনের কথা রক্ষা করে, দ্বিতীয়বার টেপ করা

কথা বাজালে আর সে পুরনো কথা ধরে রাখতে পারে না। তাহলে মগজের ক্যাসেটে কতইনা বড় ফিতা! হয়তো কোটি কোটি মাইল লম্বা, হয়তো অনন্ত। আর ক্যাসেটকে উল্টা দিকে ঘুরিয়ে পূর্বের কথা শুনতে হয় কিন্তু মানুষের ক্যাসেট উল্টানোর কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু মনে করলেই সে পূর্বের স্মৃতিবিজড়িত কথাটি বলতে পারে।

ভাববার কথা হচ্ছে, একজন শিক্ষক ছাত্র পড়ান, বক্তা বক্তৃতা দেন, উকিলরা হাজারো যুক্তি করেন, জজ রায় লেখেন এবং আমরা অজস্র কথা বলি, যুক্তি করি। পেছনে বসে বসে কে এই শিক্ষককে, বক্তাকে, উকিলকে, জজকে, সাধারণ মানুষকে কথার পর কথা গুছিয়ে দেন। নিজে এত নিরব থেকে সবাইকে কথা বলান কে এই অলক্ষ্য? কে এই নিরব কর্মী?

আরেকটি ভাববার কথা সে হল, বাদ্যকারেরা বাদ্য বাজান, ধরুন একজন বাদ্যকার একটি হারমোনিয়ামে বাম হাত দিয়ে ব্যালট চাপে, ফলে হারমোনিয়াম পো পো শব্দ সৃষ্টি হয়। বাদ্যকার ডান হাত রিডের উপর টিপেটিপে তার মনের অজান্তে লুকোনা সুর এবং ছন্দময় গানের কলি মধুময় করে প্রকাশ করে।

মানুষের ডায়াফ্রাম এবং ফুসফুস যখন সংকুচিত হয়, ফুসফুসের বাতাস তখন উপরের দিকে দ্রুত বেগে প্রবাহিত হয়। সেই বায়ু স্বরথলির ভোকাল কর্ডকে (স্বররজ্জু) আন্দোলিত করতে থাকে। ফলে, বায়ুতে কম্পন সৃষ্টি করে শব্দে পরিণত হয়। এই শব্দ জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁটের দ্বারা বাক্যে পরিণত করে মানুষ তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। সুতরাং মানুষকে বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়ামের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু একটা প্রশ্ন এই যে, হারমোনিয়াম একটি যন্ত্র বিশেষ, তার বাদ্যকার নিকট থেকে সরে গেলে বাদ্যযন্ত্রটি শুধু নিরেট একটা যন্ত্রে পরিণত হয়ে পড়ে থাকে, আর তার থেকে রাগ-রাগিনীর সুরধ্বনি বাতাসে ঝংকার তোলেনা। ঠিক মানুষরূপ হারমোনিয়াম থেকে আসল বাদ্যকার মানুষটি শূন্যে উড়ে চলে গেলে, দাঁত, জিহ্বা, ওষ্ঠ্য, ভোকাল কর্ড, ফুসফুস এবং ডায়াফ্রাম বিশিষ্ট হারমোনিয়ামটি পড়ে থাকে। শত চেষ্টায়ও তার সুললিত কণ্ঠে একটি বাক্যও ফুটে ওঠে না অর্থাৎ মানুষ রূপ যন্ত্র থেকে আসল বাদক যখন সরে যায়, সমস্ত দেহ যন্ত্রটি তখন বিকল হয়ে যায়। কে সেই বাদক যে এই মানুষ যন্ত্রটিতে এত অজস্র কথা এবং সুরের ধ্বনি বাজিয়ে তোলে? তাই তো–

মানুষ মাঝে সে কোন মানুষ,
এবার খুঁজে দেখনা তাই।
কয় সে কথা নিরালাতে,
বুঝবি না তা যাতে তাতে।
আয্‌হার বলে বাজার দরে,
করিসনে তোরে যাচাই।
মানুষ মাঝে আছেরে মানুষ,
এবার খুঁজে দেখনা তাই।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের অপমৃত্যু

আজ দীর্ঘদিন যাবৎ একটি মতবাদ দুনিয়ায় প্রচলিত হয়ে আছে। এই মতবাদটি হচ্ছে, ডারউইনের দেয়া মানুষ সৃষ্টির আদি কারণ বা বিবর্তনবাদ তত্ত্ব। ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতে মানুষ পূর্বে বানরের বংশধর ছিল। কালের বিবর্তনে মানুষ রূপ ধারণ করেছে। তিনি আরও বলেছেন, জীবের আদি পিতা ছিল এক কোষ বিশিষ্ট সামুদ্রিক শেওলা। পরে রূপান্তরিত হয়ে বানর এবং সর্বশেষ মানুষরূপ ধারণ করেছে।

'মানুষ কোথা থেকে এল' এই মতবাদ যখন তিনি প্রকাশ করলেন, দুনিয়ার মানুষ তখন এই মতবাদ চোখমুখ বুজে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মতবাদটির মৃত্যু হয়েছে। বিজ্ঞানী সেলভানও বলেছেন, "বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে বিজ্ঞানের বহু বহু তত্ত্ব (Theory) পরিবর্তনশীল।" ডারউইনের মতবাদের ভেতর এমন কতগুলো মারাত্মক ভুল আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানে ধরা পড়েছে এবং তার মতবাদকে একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে অধ্যাপক গোলাম সোবহান দৈনিক ইনকিলাব, ২৯শে পৌষ, ১৩৯৭ সংখ্যায় "যুক্তির কষ্ঠিপাথরে ডারউইনের বিবর্তনবাদ" শিরোনামে যে মতবাদ প্রকাশ করেন, তার দু' একটি এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

১। যদি বানর জাতীয় জীব থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি ঘটে থাকে, তাহলে আধা বানর, আধা মানুষ এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লেজ বিশিষ্ট মানুষ পাওয়া যেত। কিন্তু এসবের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না।

২। D.N.A (ডি এন. এ) এর রাসায়নিক পুনর্বিন্যাস ব্যতীত প্রজাতির রূপান্তর সম্ভব নয়। জীবকোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রমোজমের (ডি-অক্সি-রিবোনিউক্লিক এসিড) হচ্ছে প্রজাতির বংশধারা বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। এর মাধ্যমে আদিম মানব- মানবী, মানব জাতির মধ্যে জিইয়ে রয়েছে।

ডি.এন. এ এর পাকানো দড়ির মত দু'টো শিকলের মধ্যে অ্যাডিনিন (A.) গুয়ানিন (G) সাইটোসিন (C) এবং থাইমিন (I) নামক মাত্র চারটা জৈব ক্ষারকের (A.G.C.I) বিন্যাসের সংকেত লিপিতে প্রজাতি বংশধারা বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ থাকে। এ হচ্ছে খোদায়ী কুদরত ও হেকমতের আরেক অপূর্ব নজীর। ডি.এন. এ-এর বিন্যাসে সামান্য হেরফের থাকলে বা এর কোন ভুল সংকেত দিলে, প্রাণী নানা রূপে রোগাক্রান্ত হয়। পৃথিবীতে বিরাজমান পনের/বিশ লাখ প্রাণী প্রজাতির ডি.এন. এ-এর A.G.C. I এর বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন।

প্রাকৃতিক নির্বাচন, জীবন সংগ্রাম, পরিবেশ ও যোগ্যতমের উর্ধ্বতন প্রভৃতি ভৌত উত্তেজক প্রাণীর অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের ভৌত পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিন্তু ডি. এন. এ-এর গঠনের রাসায়নিক পুনর্বিন্যাস ঘটাতে পারে না। ডি. এন. এ- এর গঠনের পুনর্বিন্যাস ব্যতীত প্রজাতির রূপান্তর সম্ভব নয়।

মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বা জিনের পুনর্বিন্যাস হিরোশিমা, নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ প্রমাণ করেছে যে, এটি অবক্ষয়ী ও প্রাণঘাতী। মিউটেশন ব্যতীত ডি. এন. এ-এর গঠনের পুনর্বিন্যাস তথা নতুন প্রজাতিতে রূপান্তর সম্ভব নয়। জৈব বিবর্তনবাদ গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত জুয়াচুরি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৩। জৈব বিবর্তনবাদ মানুষের অনেক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, যথা ঃ আমিত্ববোধ বা মুক্ত ব্যক্তিসত্ত্বা, মন, আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, চিন্তা, উদ্দেশ্য, মননশীলতা, শিল্পচর্চা, সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ, ধর্মীয় অনুভূতি, জীবনবোধ, নীতিবোধ, সত্যান্বেষা, আদর্শবাদিতা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, মহানুভবতা, পরার্থপরতা ইত্যাদি। এগুলোকে বাদ দিলে মানুষ আর পশুর মধ্যে আর কোন ফারাক থাকে না।

যে মতবাদ মানুষের গোটা বাস্তবতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তার বিশ্বাসযোগ্যতা কতদূর? এতদসত্ত্বেও কেউ নিজেকে যদি বানরের বংশোদ্ভুত বলে মনে করে তৃপ্তি লাভ করতে চায়, তবে তার এ তৃপ্তি লাভে বাধা দেয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

আসলে মানুষ যে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে ডারউইন যে মতবাদ দিলেন, তা আসলে যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তার দেয়া মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। ডারউইনের মতে বানর হতে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ডারউইন একটি মানুষও সৃষ্টি করতে পারেননি, তিনি শুধু মানুষ সৃষ্টির ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির আদি বা আসল ব্যাখ্যা যিনি দিলেন, তিনি ডারউইনকেও সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) থেকে মানুষ সৃষ্টি শুরু হয়েছিল। কিন্তু ডারউইনকে যিনি সৃষ্টি করলেন, তার ব্যাখ্যাই কি গ্রহণ করব, না যিনি নিজে বানর হতে সৃষ্টি হয়েছেন বলে বলেন, তার কথাটা গ্রহণ করব?

যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি বলেন, *"খালাকাল ইনছানা ওয়া আল্লামাহুল বায়ান"* (আল্-কুর'আন) অর্থাৎ (আমি আল্লাহ্) মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তাকে বাকশক্তি দিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, *"খালাকাল আজওয়াজা কুল্লাহ মিম্মাতুমবিতুল আরদে ওয়ামিন আন ফুছিহিম ওয়া মিম্মা লা ইয়া' লামুন"* (আল্-কুর'আন)- অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদকে এবং (মানুষ) তোমাদেরকে এবং আরও (অনেক কিছু) যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

৫ম অধ্যায়

সত্যই কি মহাবিশ্বের কোন স্রষ্টা আছেন?

এ পর্যন্ত এই বইতে যে সব আলোচনা করা হয়েছে, তার মূল কথা এই যে, মহাবিশাল মহাবিশ্ব এবং অনন্ত শূন্যতা ও এই মহাবিশ্বের বৈচিত্র্যময় অজস্র সৃষ্টি, এদের পেছনে একজন মহাস্রষ্টা আছেন, যিনি প্রতিনিয়ত সজাগ থেকে এই মহাবিশ্ব এবং তার মধ্যস্থিত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। ধর্ম বিশ্বাসী মানুষেরা এই মহাস্রষ্টাকে কেউ আল্লাহ্ নামে আখ্যায়িত করেছে, কেউ গড বলেছে, কেউ ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছে।

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে আসলেই আল্লাহ্ বা মহাস্রষ্টা বলতে কিছু আছে কিনা? যদি তার অস্তিত্ব থেকেই থাকে, তবে তার সম্যক উপলব্ধি বা তার সান্নিধ্য লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করার আগে মানুষ সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

মানুষ মনে করে মহাস্রষ্টার তুলনায় মানুষ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী এবং এত ক্ষুদ্র যে, সে তার ধারণাতেই আনতে পারে না। কাজেই এই অত্যন্ত সীমিত প্রাণী মানুষ অনন্ত অসীম আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিভাবে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারে? যেমন একটা ছারপোকা বিশ্বের আয়তন সম্বন্ধে কিছুই সঠিক ধারণা আনতে পারে না কিন্তু মানুষের বেলায়, এই নিয়ম খাটে না, কারণ যারা মানুষের দৈহিক অবয়বটাকেই মানুষ বলে অর্থাৎ এই জাহেরা শরীরী মানুষটাকে মানুষ মনে করে, তারা কখনও আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, তা কখনও বিশ্বাস করতে পারে না।

এবারে আসল মানুষ কাকে বলে, তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আসলে মানুষ দু'প্রকার। প্রথম নাক, মুখ, চোখ, কান, হাত, পা, মাথা, পেট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি মানুষটি, এটাকে বলে জাহেরা বা বাহ্যিক মানুষ। এই জাহেরা মানুষের ভেতর আরেকটি বাতেনি মানুষ বিরাজ করে, সেই হচ্ছে আসল মানুষ। আর বাইরের এই যে জাহেরা মানুষটি, একে বলে নকল মানুষ বা খোলস মানুষ। যেমন আসল সাপ আর তার খোলস ছেড়ে জংগলে চলে যায়, নকল সাপটি অর্থাৎ খোলসটি পথে পড়ে থাকে। স্বল্পালোতে মানুষ তাকে দেখে লাঠি সোটা নিয়ে তাকে পিটাতে যায়। খোলস সাপটিকে মানুষ যতই পিটাক, আসল সাপ তার কিছুই টের পায় না, জঙ্গলে বসে ব্যাঙ ধরে খায়। মানুষের বেলায়ও ঠিক তেমনি। জাহেরা মানুষের ভেতর একটা বাতেনি মানুষ থাকে, সে মরণ কালে সাপের মত জাহেরা খোলসটি ছেড়ে আপন দেশে চলে যায়, মানুষ খোলসটি

নিয়ে কান্নাকাটি করে, মাতম করে। নকল মানুষটির ভিতরে যে আসল মানুষটি থাকে, তার এই নকল মানুষের মত শরীর আছে। জাহেরা মানুষের মতই তার মাথা, চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা ইত্যাদি আছে। কিন্তু তা অদৃশ্য। সে মানুষটি তার গুপ্ত দেহ নিয়ে নকল মানুষের ভেতর সুপ্ত হয়ে থাকে। সে মানুষটি যখন নকল মানুষকে ছেড়ে যায়, তখন নকল মানুষ চিরদিনের মত নিরব হয়ে যায়।

একটি উদাহরণ দিলে আরও পরিস্কার হবে। মনে করুন, আব্দুর রহিম মরেছে। উঠানে তার মৃত দেহটা শুইয়ে রাখা হয়েছে। এখন তার মাথা দেখিয়ে যেদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, এটা আব্দুর রহিমের কি? তাহলে মানুষ উত্তর দেবে, এটা তার মাথা। এভাবে তার নাক, মুখ, চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, সবাই উত্তর দিবে, এগুলো আব্দুর রহিমের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাহলে দেখা যাবে আব্দুর রহিমের মরল কি? এই যে দেহের সব থাকতেও এমন একটি জিনিস থাকে না, যার কারণে দেহ জন্মের মত নিশ্চল হয়ে যায়। এই যে জিনিসটি না থাকার কারণে দেহের সব থাকতেও কিছুই থাকে না, সবই অচল হয়ে যায়, এই জিনিসের নামই হচ্ছে আসল মানুষ বা আত্মা।

এই মানুষটি কোন একদিন সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তার মরণ নেই, আছে শুধু অভিনব রূপান্তর। মৃত আব্দুর রহিমের ভেতর যে আসল আব্দুর রহিম ছিল, সে আব্দুর রহিমের জাহেরা জিহ্বা থেকে তার আসল জিহ্বা টেনে বের করে নিয়ে গেছে। এই জন্য আব্দুর রহিমের জাহেরা জিহ্বা থাকা সত্ত্বেও সে আর কোনদিন কথা বলতে পারল না। আসল আব্দুর রহিম ভেতর থেকে তার চক্ষু টেনে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাইতো জাহেরা আব্দুর রহিমের চোখের রোঁশনাই চিরদিনের জন্য নিস্প্রভ হয়ে গেল, আলোহীন হয়ে গেল তার চোখের তারকা। এমনিভাবে আব্দুর রহিম তার হৃদপিন্ড নিয়ে বের হয়ে গিয়েছে, এই জাহেরা আব্দুর রহিমের জাহেরা হৃদপিন্ড থাকা সত্ত্বেও সেটি আর কোনদিনও স্পন্দিত হল না।

মানুষের ভেতর যে আত্মা বা রুহু আছে, এই রুহের অসীম শক্তি আছে। এই রুহুকে যদি বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনুশীলন করে জাগ্রত করা যায়, তাহলে সে অসীম শক্তির অধিকারী হয়। তার শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, অনুধাবন শক্তি ইত্যাদি ধারণাতীতভাবে উন্নত হতে পারে এবং তখন সে মহাস্রষ্টা আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিনকে উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ্ বলে একজন মহাস্রষ্টা আছেন কি না তা সে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখে বিশ্বাস করতে পারে, তাঁর সঙ্গে সে কথাও বলতে পারে।

এই মর্মে পবিত্র কুর'আন শরীফে বলা হয়েছে, *“কাদ আফলাহা মান জাক্কাহা, ওয়া কাদ খাবা মান দাচ্ছাহা”* অর্থাৎ যারা তাকে (আত্মাকে) বিশেষ প্রক্রিয়ায় (অনুশীলন করে) জাগ্রত করতে পেরেছে, তারাই হয়েছে সফলকাম, (অর্থাৎ আমি আল্লাহ্) আমাকে উপলব্ধি করেছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তারাই (একগুঁয়ে সাধনাহীন যুক্তিবাদীরা) যারা তাকে (আত্মাকে) মাটি চাপা দিয়েছে (বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনুশীলনের অনুসন্ধান না করে, সাধনা না করে, শুধু খোলস মানুষকে মানুষ বলে বিশ্বাস করে বসে আছে)- আল্ কুর'আন।

এইবার একটি ভাববার কথা হচ্ছে, কুর'আন শরীফে এই যে বলা হল, যারা মানুষের ভেতর আসল মানুষকে মাটি চাপা দিয়েছে, তাদের সর্বনাশ হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করে বলতে পারে, আমি ত শুধু আমাকেই দেখি, আমার ভেতরের মানুষটাকে দেখিনা, তাকে আবার কেমন করে জাগ্রত করা যাবে? যাকে মোটেও দেখা যায় না এবং চেনা যায় না তাকে আবার কেমন করে জাগ্রত করা যাবে?

একটি জাহেরা মানুষের ভেতর আরেকটি বাতেনি মানুষ থাকে এবং তাকে বিশেষ অনুশীলনে কতকগুলো বিধিবিধান অবলম্বনের মাধ্যমে চেষ্টা করে জাগ্রত করা যায় এবং জাহেরা মানুষকে বাতেনি মানুষ বা আত্মাকে আলাদা করা যায়, এটা হচ্ছে একটা থিওরি (Theory) যা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা জানিয়ে বললেন, “আমি আল্লাহ্ আমাকে যদি উপলব্ধি করতে চাও এবং আমার সাথে নৈকট্য সৃষ্টি করতে চাও, তাহলে আমার দেয়া নির্দেশ মেনে আমাকে ডেকে দেখ, আমি একান্তভাবে তোমার নিকটই আছি কিনা, তার প্রমাণ পাবে বা সঙ্গে সঙ্গে তোমার ডাকের সাড়া দেব।”

এই মর্মে তিনি মানুষকে আরও জানিয়েছেন, *“ফাজকুরুনী আজকুরুকুম”*- অর্থাৎ “তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব।” এখানে বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্র সরাসরি সম্বন্ধের কথাই বলা হয়েছে অর্থাৎ বান্দার সাথে তার সরাসরি আলাপ হবে, এ কথাই বলা হয়েছে। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন, *“ওয়াদউনি আস্তজিবলাকুম”* “অর্থাৎ- আমার কাছে প্রার্থনা কর (আমার কাছে যা চাও, আমার সান্নিধ্য চাও) আমি কবুল করব।” পবিত্র কুর'আন শরীফে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের এই সব ঘোষণা থেকে একটা স্পষ্ট থিওরির (Theory) প্রতিফলন বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ বান্দাকে একটি থিওরি জানিয়ে দিলেন যে, মহাবিশ্বের মহাস্রষ্টার অস্তিত্ব ধ্রুবভাবে অনুভব করা যায় এবং তার সাথে বান্দার কথা বলা বা আলাপ হওয়া সম্ভব।

বিশ্বের সমস্ত বুদ্ধিজীবি প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষের একটা প্রধান বাতিল চিন্তা এই যে, আসলে আল্লাহ্র অস্তিত্ব আছে কিনা? আখেরাত সত্য কিনা? নবী রাসূল সত্য কিনা? কুর'আন আল্লাহ্র বাণী কিনা? এমন কি দর্শন শাস্ত্রেও (Philosophy) কতকগুলো প্রধান সমস্যা রয়েছে, যেমন আল্লাহ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদি। উপরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের যে বাণীগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে তা থেকে আমরা একটি থিওরি পেয়েছি যে, তিনি ডাক দিলে শোনেন এবং জবাব দেন। এটাকে আমরা আল্লাহ্র দেয়া একটি থিওরি বলে ধরে নেব এবং তা পরীক্ষা করে দেখব।

আমরা জানি, মানুষের সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, প্রকৌশল জীবন, দৈনন্দিন জীবন ইত্যাদি প্রত্যেকটির পেছনে একটি করে থিওরি বা মতবাদ আছে। এরকম প্রত্যেকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর প্রত্যেক জ্ঞানী লেখকের থিওরি দেয়া আছে। মানুষ তা নির্বিবাদে মেনে চলেছে এবং তা মেনে মানুষ সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা এক একটি থিওরি বা মতবাদ দিয়েছেন, যা মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে গ্রহণ করেনি। **একটা অত্যাশ্চর্য জিনিস এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা যে থিওরি দিয়েছেন, তার কোন কোনটি একেবারেই ডাহা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে আছে। যেমন গণিত বিজ্ঞানীরা থিওরি দিলেন, দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই কিন্তু তার অবস্থান আছে, তার নাম বিন্দু।**

ম্যাজিক খেলায় যাদুকরেরা যেমন তাসের খেলা দেখায় এবং তাস থেকে মিথ্যা টাকার নোট বানিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয়, অংক শাস্ত্রের ঐ থিওরিটা ঠিক তাসের খেলার মত একটা মিথ্যা থিওরি। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় এই যে, সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানীলোক এই মিথ্যা থিওরিটাকে মিথ্যা বলে অবিশ্বাস করলেন না এবং এই মিথ্যা থিওরির উপর বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী কাজ করে তারা বাস্তবে চন্দ্রের পৃষ্ঠে গিয়ে ঠেকলেন।

অংকের এই থিওরি (Theory) কে মিথ্যা বলা হয় এই কারণে যে, যত ক্ষুদ্র জিনিসই হোক না কেন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ ছাড়া তার অবস্থান হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। তাহলে বিন্দুর অবস্থান কেমন করে সম্ভব হয়? বিন্দুর এই থিওরিটিকে বিশ্বাস করা হয়েছে এই জন্য যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু মতবাদ আছে যা প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু যুক্তিহীনভাবে মেনে নিতে হবে এই যে থিওরিটি সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক মেনে নিতে হবে। অথচ প্রমাণ করা যাবে না, একে বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ বা Postulate। জ্ঞানীজনেরা এই Postulate বা স্বতঃসিদ্ধ থিওরিটিকে চোখ মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন। কোন প্রশ্ন করেননি একটি কারণে যে, তাদের জ্ঞানের দ্বার খোলা ছিল। এখানে তাদের একগুয়েমি ছিল না এবং যে জ্ঞানী এই স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ বা থিওরি দিয়েছেন, তাদের মতবাদকে তারা শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। যদিও থিওরি তাদের নিকট ভুল মনে হয়েছে, তথাপি তারা এরূপ মনে করেছে যে, অন্যের একটা মতবাদকে পরীক্ষা করে দেখলে, দেখা যাক কি ঘটে বা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়। এই ভাবে তারা একটা মিথ্যাকে পরীক্ষা করে দেখেছে যে, এথেকে একটা সত্যকে আবিস্কার করা যায়। যেমন বিন্দু একটা মিথ্যা থিওরি (Theory) যা দিয়ে একটা সরল রেখার অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা এসব মতবাদ যে দিয়েছেন, তার কোনটি মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে ছাড়েনি। যদি পরীক্ষা করে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সে থিওরি বা মতবাদকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে। আর যদি সে থিওরি গ্রহণ করে সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে সে সেই মতবাদটি গ্রহণ করে সে যা ছিল তা থেকে জ্ঞানের উন্নতস্তরে উন্নীত হয়েছে এবং সে যা জানতো না, অন্যের থিওরি বা মতবাদ মেনে, তা জেনেছে এবং সে অজানা জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে।

কিছু আগে বলা হয়েছে একটি থিওরির কথা, যে থিওরি মহাসৃষ্টির মহাস্রষ্টা বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানীগুণী এমনকি মূর্খের কাছেও স্থাপন করলেন, সে হ'ল আল্লাহ্ বলতে একটা মহাশক্তি আছে। মানুষ তাকে ডাক দিলে তিনি শোনেন এবং তার জবাব দেন কিন্তু ডাকটি তার মত অনুযায়ী হতে হবে।

বিন্দুর মিথ্যা থিওরিটি মেনে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা যেমন একটা সরল বা বক্ররেখার সন্ধান পেয়েছিল, কৌণিক দূরত্বের সন্ধান পেয়েছিল এবং চন্দ্রে যাওয়ার মত সৌভাগ্য অর্জন করেছিল, যেটা মানুষ কোনদিন বিশ্বাস করত না এবং চন্দ্রে যাওয়াটা একটা কল্পনা মনে করত। যে মানুষ বিন্দুর থিওরি দিলেন এবং যারা এটা বিশ্বাস করল, তাদের সবাইকে যিনি সৃষ্টি করলেন তার থিওরিটাকে মানুষ বেমালুম অস্বীকার করে কেমন করে? পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে দেখে কেমন করে বলে, যে আল্লাহ্ একটি কাল্পনিক নাম? এরকম অনেক থিওরি আছে যা মেনে নিতে হবে কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না। এটা যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণ হয়, তবে ধর্ম একটা সবার উপরে বড় বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র যা সর্ব শাস্ত্রের বড় শাস্ত্র। স্রষ্টা আছেন কিনা এটা নিয়ে যারা ঘোলায় পড়েছেন তাদের কথা অনুযায়ী এটা মহাভাবনার ব্যাপার।

ধর্মবিজ্ঞানে আল্লাহ্ আছেন এটা কেন ধরে নেয়া যাবে না ধরে নিলাম আল্লাহ্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে বলে একজন মহাবিজ্ঞানী মুহাম্মদ (সাঃ) একটা স্বতঃসিদ্ধ থিওরি দিলেন যে, আল্লাহ্কে চোখে দেখান যাবে না কিন্তু আসলে যে তিনি আছেন এবং ডাক দিলে তিনি সাড়া দেন। মহানবীর এই থিওরিকে যিনি আল্লাহ্র থিওরির সাথে মিলিয়ে কথা বললেন, স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়ে সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবিশ্বাসীরা যদি ভুল প্রমাণ করে দেখতে পারত, তবেনা বলতে পারত যে, মহানবীর থিওরি ভুল, যা তারা মানুষের দেয়া থিওরিকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। আমার বিনীত প্রশ্ন এই যে, মহানবীর দেয়া এই থিওরিটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে তারা কি একবারও জীবনে পরীক্ষা করে দেখেছে?

মানুষের একটা সহজাত স্বভাব এই যে, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অনেক অনেক তথাকথিত জ্ঞানী লোকই সবচেয়ে বড় ভুল করে এবং কত ভুল আছে, যেগুলো ভুলেরও ভুল, যে ভুল জীবনে দু'বার হয়না, মাত্র একবারই হয়। অনেক অনেক ভুল আছে যা জীবন থাকতে সংশোধন করার সময় এবং সুযোগ থাকে কিন্তু দু'একটা ভুল এমন আছে, যদি সে ভুল একবার হয়, তা সংশোধনের আর সুযোগ থাকে না। যেমন আল্লাহ্, রাসুল, আখেরাত, কবর, হাশর, পরকালে বিশ্বাস এগুলোর সম্বন্ধে যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল করে মানুষ একবার কবরে চলে যায়, তাহলে এ ভুলের আর কোনদিনও সংশোধন হবে না।

একজন বৈজ্ঞানিকের একটি তথ্য বা মতবাদ বোঝার জন্য একজন জ্ঞানী লোক অনেক

চিন্তা ভাবনা করে এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। যেমন- আইনস্টাইনের থিওরি (Theory of Relativity) কান্ট, ডেক ইত্যাদি। এদের থিওরি বা মতবাদ পরীক্ষা করে দেখার জন্য দুনিয়াজোড়া সকল আস্তিক-নাস্তিক কোমর বেঁধে লেগে গেল। তাদের থিওরি পরীক্ষা করে তবে না ক্ষান্ত হ'ল এসব বিজ্ঞানীরা, দার্শনিকরা তো মানুষ ছিল, তাদের থিওরি পরীক্ষার জন্য মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এমনকি থিওরি পরীক্ষা করার জন্য জীবনকে উৎসর্গ পর্যন্ত করে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

যেমন পটাশিয়াম সায়ানাইড (KCN) নামে এক প্রকার মারাত্মক বিষ আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনুমান করা গেল, এটা হয়তো মারাত্মক বিষ হবে। যে থিওরি দিয়ে এই বিষটা সৃষ্টি করা হল, সে থিওরিটি বাস্তবিক পক্ষে সত্য না মিথ্যা পরীক্ষা করার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তৈয়ার হয়ে গেল। স্ত্রী বলল, প্রথমে এই বিষটি পান করে আমি পরীক্ষা করে দেখব। স্বামী বলে, তা হয় না। তুমি যদি বিষ পরীক্ষা করে মর, তাহলে আমি এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারব না সুতরাং বিষটি আমিই পান করব এবং কলম ধরে আমি লিখব, এ বিষটি টক না মিষ্টি।

সত্যি সত্যিই স্বামী হাতে প্রথমে একটি কলম নিয়ে কাগজের উপর কলমের মাথা ঠেকিয়ে বিষ পান করেছিল। তৎক্ষণাৎ মরণের কোলে ঢলে পড়তে পড়তে শুধুমাত্র একটি অক্ষর "S" লিখতে পেরেছিল, আর লিখতে পারেনি। তা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল বিয়োগ বিধুরা স্ত্রী। চিৎকার দিয়ে সে বলে উঠল, "হে প্রাণের স্বামী যে থিওরি পরীক্ষা করতে যেয়ে প্রাণ হারালে এবং আমাকে বিধবা করলে, সেই থিওরি পরীক্ষা করে দেখতে এবং সমাধা করতে আমিও তোমার সঙ্গে পরপারের যাত্রী হয়ে যাব। আমিও এই থিওরির জন্য আমার প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে যাব।" এই বলে স্বামী যে অক্ষরটি লিখে মরণ বরণ করেছিল, সেও সেই অক্ষরের ডান পাশে কলমের মাথা ঠেকিয়ে বিচ্ছেদ-বেদনাতুর হৃদয়ে অশ্রুভরা আঁখি দু'টি কলমের দিকে মেলে কম্পিত হাতে, নিশ্চিত মৃত্যুকে জেনে সেই মহাবিষ পটাশিয়াম সায়ানাইড (KCN) তার নিজের মুখে তুলে নিল।

চোখের পলকে সে লুটিয়ে পড়ল তার স্বামীর মৃত দেহের উপরে। ডানে একটি অক্ষর লিখতে পেরেছিল সে স্ত্রী। দুনিয়ার ক্ষণিক জীবনের একটি মতবাদ বা থিওরিকে পরীক্ষা করার জন্য মরণের কি মাধুরী মাখানো দৃশ্য এই দম্পতি যুগলের!! পটাশিয়াম সায়ানাইড (KCN) এর থিওরি পরীক্ষা করার জন্য কিভাবে মানুষ আত্মাহুতি দিল! আল্লাহর থিওরি এবং রাসূলের (সাঃ) থিওরি পরীক্ষা করে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য একটু চিন্তা করাও কি উচিৎ ছিল না, একটু পরীক্ষা করাও কি উচিৎ ছিল না?

মহানবী (সাঃ) যিনি মানব সমাজেরই একজন মানুষ ছিলেন, তার থিওরিটা জ্ঞানীদের একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল সত্যি কি মিথ্যা। আরেকটি ভাববার বিষয় এই

যে, বিশ্বে কেউ বলতে পারে না যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকরা জীবনে একটাও মিথ্যা কথা বলেননি, এ রকম কোন সাক্ষী নেই। একটি মিথ্যা কথা সারা জীবনে বলেনি, এ রকম কেউ নেই। এ রকম কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক নেই। কিন্তু মহানবী (সাঃ) শিশুকাল থেকে মরণকাল পর্যন্ত কোনদিন কোন কালে কোনভাবে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন, এ রকম কোন প্রমাণ (Record) নেই।

তার চরম সমালোচক ইহুদি, খৃষ্টান এবং অন্যান্য বিধর্মী ঐতিহাসিকগণ জোর দিয়ে বলেছেন এবং ইতিহাসে লিখেছেন যে, আরবে **মুহাম্মদ (সাঃ) নামে একজন নবী শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা মিথ্যা কথাও বলেননি**। সুতরাং তিনি যে বলেন, আল্লাহ্ আছেন এবং ডাক দিলে শোনেন, এই কথার উপর ভিত্তি করে তিনি লক্ষ লক্ষ কথা বলে গেছেন, এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তার দন্ত মোবারক শহীদ হয়ে গিয়েছিল। এই কথাগুলো কি নিশ্চয় ভেবে দেখার মত কথা নয়? অবিশ্বাসীদের মাথায় কি হয়েছে?

এবার ভাবতে হয়, যে মানুষটি জীবনে একটি মিথ্যা কথাও বলেননি, সেই মহানবী (সাঃ), মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী থেকে জানিয়ে গেছেন, *"ওয়াল্লাযীনা কাফারু ওয়া কাজ্জাবু বি আয়াতিনা উলাইকা আছহাবুন নারে হুম ফি হা খালিদুন"* (আল কুর'আন) অর্থাৎ- যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে এবং মহানবী, আখেরাত এবং কুর'আন শরীফ ও হাদিস শরীফকে অবিশ্বাস করেছে এবং কুফরি করেছে আর বলেছে মিথ্যা আমার নিদর্শনসমূহকে (আমাকে অবিশ্বাস করেছে), তারাই হচ্ছে চিরস্থায়ী অধিবাসী জাহান্নামের।

যারা রাসূলের (সাঃ) এবং আল্লাহ্‌র থিওরিকে পরীক্ষা না করে, নিজের মনগড়া জ্ঞান দিয়ে বুলি আওড়িয়ে, নানা হেরফের যুক্তি করে উড়িয়ে দিল এবং কোনদিন আল্লাহ্ এবং রাসূলের (সাঃ) দিকে ফিরলো না এবং আখেরাত বিশ্বাস করল না, তাদের কি অবস্থা হবে? ধরে নেয়া যাক, আল্লাহ্ এবং রাসূলের (সাঃ) থিওরি মিথ্যা ছিল, এসব ভুল এবং অলীক, তাহলে অবিশ্বাসীরা এবং নাস্তিকেরা মরণের পরে বেকসুর খালাস পাবে। কিন্তু যদি মরণের পরে আল্লাহ্‌র কথা যদি সত্য হয়, রাসূলের কথা সত্য হয়, কুর-আন শরীফ সত্য হয়, কবরের আজাব সত্য হয়, বেহেশ্‌ত দোজখ সত্য হয়, ফেরেস্তা সত্য হয় এবং কুর-আন শরীফ সত্য হয়ে গলায় বেঁধে যায়! আর মহানবীর একটি বাণী, "মরণকালে একটি বেঈমান লোকের রুহ্ কবজ করার সময় এতদূর কঠিন আজাব হবে যে, একটা তাজা বকরিকে জবেহ না করে, তাজা অবস্থায় তার সমস্ত দেহের চামড়া ছাড়িয়ে নিলে ঐ বকরিটির যতদূর কঠিন আজাব হয়, একজন বেঈমান, অবিশ্বাসীর মরণকালে তার চেয়ে সত্তরগুণবেশি আজাব হবে এবং এই বেঈমান লোককে মরণের পরে কবরের দুই ফেরেস্তা এত জোরে আঘাত করবে যে, যেখান থেকে বেলা ওঠে এবং যেখানে গিয়ে

বেলা ডোবে, এতখানি জায়গা জুড়ে তার প্রথম পিটুনির আওয়াজ শোনা যাবে।"

যদি এই হাদিস শরীফ মরণের পর সত্য হয়ে যায়, তাহলে একটা মহাবিপদ এই হবে যে, দুনিয়ায় ফিরে এসে সংশোধনের আর উপায় থাকবে না। কারণ তুমি যেই গেলে সেইতো গেলে, জীবদ্দশায় ভুল সংশোধন করার জন্য আর ফিরে আসা যাবে না।

জ্ঞানী লোক কোনদিনও ক্ষণিকের লাভের বশীভুত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থকে বিসর্জন দেয় না। দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণিকের, আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ায় কোর্টে যদি কেউ মামলায় হেরে যায়, তাহলে আপিলের জন্য উপরের একটি কোর্ট পায়; নিচের কোর্টের ক্ষতি সে উপরের কোর্ট থেকে পূরণ করে নিতে পারে। আখেরাতের জিন্দেগী হচ্ছে চিরস্থায়ী। সেখানকার কোর্টে যদি কেউ একবার মার খেয়ে যায়, তাহলে সে আপিলের জন্য উপরের আর কোন কোর্ট পাবে না। আখেরাতের জীবন যে কত অনন্ত এবং কতইনা দীর্ঘ, তা মহানবীর (সাঃ) একটি বাণীতে কিছুটা আঁচ করা যায়।

আখেরাতের জিন্দেগীর ধারণা দিতে গিয়ে মহানবী (সাঃ) ফরমায়েছেন, "এই সমগ্র দুনিয়াটাকে খালি করে যদি আসমান বরাবর সরিষার দানা দিয়ে ভরে দেয়া যায় এবং অন্য একটা দুনিয়া থেকে একটা পাখী উড়ে এসে এই দুনিয়া থেকে একটি সরিষার দানা মুখে করে নিয়ে উড়ে যায় এবং পাঁচশো বছর পরে আবার ফিরে আসে এবং আরেকটি সরিষার দানা মুখে করে উড়ে চলে যায়, এভাবে পাঁচশো বছর পর পর সরিষার দানা নিয়ে যেতে যেতে এই সমগ্র দুনিয়া ভর্তি অগণিত সরিষার দানা কোন না কোন দিন ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের মরণের পর যদি একবার আখেরাতের জিন্দেগী শুরু হয়ে যায়, তাহলে সে জিন্দেগী আর কোনদিনও শেষ হবে না।

পূর্বোল্লেখিত পটাশিয়াম সায়ানাইড (KCN) বিষ যা বিশ্ববাসীর উপকারার্থে সৃষ্টি করে তা পরীক্ষার জন্য দু'টি প্রেমিক জীবন উৎসর্গ করল। কিন্তু তারা এর বিনিময়ে কি পেল? ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় অন্যের সুখের জন্য তারা যে দু'টি জীবন উপঢৌকন দিল, তাতে যাই লাভ হোক, মহাস্রষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী যদি এই সামান্যতম দান পছন্দ না হয় এবং পরকালের অনন্ত জীবনের আইনের আওতায় তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে বিসর্জনকৃতদের আত্মার কি উপায় হবে? আর যদি তারা তাদের জীবনের সর্বশক্তি এমনকি প্রাণের বিনিময়ে মহাস্রষ্টার থিওরিটা পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দেখত, তাহলে তাদের জীবন, দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন ধন্য হত। তারা সমগ্র দুনিয়াবাসীকে তাদের প্রাণঢালা আহ্বান জানিয়ে যদি বলত, "আমরা মহাস্রষ্টা আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিনের থিওরি প্রমাণ করে ফল পেয়েছি এবং তোমাদেরকেও সেই থিওরি অনুযায়ী পথ চলার আহ্বান জানাচ্ছি, তাহলে তাদের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন এবং অনন্ত আখেরাতের জীবন সুখের হত।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব উপলব্ধি করার উপায়

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি কথা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের যাবতীয় জ্ঞান অর্জিত হয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের মূল উপাদান। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই জৈব দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ। সুতরাং এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন জ্ঞান অর্জিত হয়, তা দেহ এবং শরীরের সাথে সম্বন্ধ রাখে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় বাদে আরেকটি ইন্দ্রিয় আছে, তার নাম হচ্ছে আত্মা বা রুহু যার মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করতে পারে, তা দৈহিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রাখতে প্রয়োজন মনে করে না, যদিও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

কেউ কেউ পরম আত্মাকেই অস্বীকার করে। বলা বাহুল্য, আত্মা দু'প্রকারের, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা মানুষের দেহকে সঞ্চরণশীল বা চলমান থাকতে সাহায্য করে। আর পরমাত্মা আবার জীবাত্মাকে জীবিত রাখে। কেউ কেউ বলে, আত্মা বলতে কিছু নেই। তারা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, মানুষের মরণ কিছুই নয়। জীবকোষগুলো এক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় অথবা মানুষের দেহাভ্যন্তরে কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। তারা মরণের আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, মানুষের মরণ মানে দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যাওয়া নয়। তারা বলে, বিজ্ঞানের মতে নিউক্লিক এসিড (Neuclic Acid) নামে এক প্রকার পদার্থই মানব জীবনকে জীবন্ত রাখে এবং মানুষের মরণ মানেই নিউক্লিক এসিডের মৃত্যু।

মানবের জীবনের এবং মরণের ব্যাখ্যা এসব ব্যাখ্যাকারীদের মুখে বেশ যুক্তিসঙ্গতই শোনা যায়। কিন্তু ভাল করে ভাবলে কেমন হয়, তা এসব আত্মা অস্বীকারকারীগণ কোন দিন ভেবে দেখেনি। আগেই বলা হয়েছে, একটি মানুষের ভেতর দু'টি মানুষ থাকে একটি আসল মানুষ আরেকটি খোলস মানুষ। আত্মাটি দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। তাকে যদিও দেখা যায় না, কিন্তু সে আমাদের সর্বাঙ্গ দেখে শুনে জীবিত রাখে। যারা বলে, নিউক্লিক এসিড মানব দেহের আসল কারণ, যদি তাদের কথাই ঠিক হয়, তাহলে পূর্বের আলোচনায় কোন সমাধান পাওয়া যায় না কেন? ধরা যাক যে, আব্দুর রহিম মরে পরে আছে। তার সবই ঠিক আছে, তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনটি বিকল হয়নি। এমনকি নিউক্লিক এসিডও ঠিক আছে। সবই বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় কিন্তু লোকটি আর কেন নড়াচড়া করে না?

তাহলে এমন কিছু এ লোকটির ভেতর থেকে বের হয়ে গেছে, যার জন্য আব্দুর রহিমের দেহ আর নড়াচড়া করে না। মানুষের মরণে কি ব্যাপার ঘটে, তা পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, যে নিউক্লিক এসিডকে জীবনের আসল কারণ মনে করা হয়, মানুষের মরণের পরে সেই নিউক্লিক এসিড তার মধ্যে ইনজেকশন করে দেয়ার পরেও মানুষটি আর জীবন্ত হয়ে উঠেনি। বিজ্ঞানীরা তখন

হতবাক হয়ে মনের অজান্তেই গেয়ে উঠেছেন–

নিশ্চয় আছেন একজন,
যে অর্থে আমরা বুঝি,
যে অর্থে আমরা খুঁজি,
হয়তো তিনি নন তেমন,
নিশ্চয় আছেন একজন।

মহাস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন মানবদেহ এবং তার ইন্দ্রিয়গুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু অবস্তুকে নিজের নাগালের ভেতর ধরা যায়, এমনকি যা চোখে দেখা যায় না তা আল্লাহ্ বান্দার ভেতর সৃষ্টি করেছেন। যেমন- আমরা চক্ষু দিয়ে আলো ধরি, ত্বক দিয়ে শীততাপ ধরি, কান দিয়ে শব্দ ধরি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ ধরি, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ ধরি ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা খুব প্রণিধানযোগ্য এই যে, কোন ইন্দ্রিয় যদি বিকল থাকে, তাহলে তার যে কাজ ছিল, সে তা ঠিকমত করতে পারে না। যেমন নাকে যদি সর্দ্দি থাকে, তাহলে সে ইরানের গোলাপের সুগন্ধি আর ধরতে পারে না, কানের পর্দায় যদি কোন গন্ডগোল হয়, তবে সে কোন মধুর সঙ্গীত শুনতে পায় না, চোখে যদি পুরু পর্দা পড়ে তাহলে, সে আলো দেখতে পায় না। কিন্তু এই নাকের সর্দ্দি যদি বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে দেয়া যায়, তবে সে সুগন্ধ ধরতে পারে এবং কানের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ করলে সে কানে শুনতে পায়, চক্ষু অপারেশন করে দিলে সে আবার পরিস্কার দেখতে পায়। যে মহা ইন্দ্রিয় মানুষের ভেতরে সুপ্ত থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিচালনা করে, সেই ইন্দ্রিয়টিতে অর্থাৎ আত্মাটিতে যদি লোহার মত জং ধরে থাকে, তাহলে তা দিয়ে মহাস্রষ্টা আল্লাহ্কে ধরা যাবে না। কারণ একমাত্র আত্মা দিয়েই আল্লাহ্কে ধরা যায়।

যদিও আল্লাহ্ গায়েব বা অদৃশ্য, অদৃশ্য বা গায়েব ধরার মত অনেক যন্ত্রই আল্লাহ্ মানুষের ভেতর সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেমন শব্দ অদৃশ্য বা গায়েব যা ধরার জন্য কান তৈয়ার করেছেন, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ গায়েব তা ধরার জন্য নাক সৃষ্টি করেছেন, শীত বা গ্রীষ্ম ধরার জন্য ত্বক সৃষ্টি করেছেন। এমনকি গায়েবের ভেতর গায়েব ধরার জন্য আল্লাহ্ বান্দার ভেতর যে জিনিস সৃষ্টি করেছেন সে হচ্ছে, কেউ যদি কাউকে 'শালা' বলে গালি দেয়। 'শালা' কথাটা একটা গায়েব বা অদৃশ্য যা কানে ধরে। কিন্তু এই কথার ভেতর যে একটি অপমান রয়েছে, এটি মগজের এমন একটি সেন্টার রয়েছে যাতে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহ বা মনের ভেতর তার একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

এত রকম গায়েব বা অদৃশ্য সত্ত্বাকে ধরার জন্য যে আল্লাহ্ এত রকম যন্ত্রমানব দেহে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্ কি তার মত একটি অদৃশ্য বা গায়েব শক্তিকে ধরার জন্য

মানবের ভেতরে কোন যন্ত্রই সৃষ্টি করেননি? নাকে সর্দ্দি আটকে জং ধরে থাকলে, সে যেমন কোন গন্ধই ধরতে পারে না, ঐ রকম মানুষের আত্মাতে যদি জং ধরে থাকে, তাহলে সে আত্মা কখনও আল্লাহ্র মত একটা গায়েবকে ধরতে পারে না। এই মর্মে আল্লাহ্পাক বলেছেন, "যে আত্মাকে উজ্জ্বল পরিস্কার করতে পেরেছে, সে সফলকাম হয়েছে।" অর্থাৎ আমাকে চিনতে পেরেছে আমাকে ধরতে পেরেছে (আল কুর'আন)। সব জিনিস জ্ঞানে ধরা পড়ে না। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দিয়ে সব অনুভব করা যায় না। একটা টেলিভিশনে নৃত্যরতা একটা যুবতী নারী আপনার সম্মুখে নাচতে নাচতে আপনার চোখের মনি সর্বদা ছুঁয়ে যায় কিন্তু আপনি তাকে দেখতে পান না একটা টেলিভিশন 'অন' করলে তা আপনি দেখতে পান।

টেলিভিশন দিয়ে আপনি শূন্যের এই নারী মূর্তিটি দেখতে পান, তার মূল কারণ হল এই যে, আপনার দেখার যোগ্যতা আপনার চোখের যোগ্যতার চেয়ে আরও বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন একটা জিনিসের সাথে যোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু শূন্যের ভেতর আপনার চোখের সম্মুখে এই অধিক যোগ্য জিনিস টেলিভিশনটি, যা আবিষ্কার করতে বৈজ্ঞানিকদের কি পরিমাণ জ্ঞানের অনুশীলন করতে হয়েছিল এবং কতদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল?

এমনিভাবে মানুষ যদি তার জং ধরা আত্মাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারে, তাহলে সে এই আত্মার টেলিভিশনে আল্লাহ্কে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। আত্মা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী জিনিস এবং এর বিস্তৃতি এত যে মহাবিশ্ব এবং অনন্ত শূন্যতার চেয়ে অনেক বেশী । একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। এই মাটির পৃথিবীটাকে যদি পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, গ্রাম-গঞ্জ ইত্যাদি সবই সরিয়ে দিয়ে একেবারে খালি করে দেয়া যায় এবং পৃথিবীর এক কোণে যদি একটি সরিষা দানা রাখা যায়, তাহলে সেই সরিষা দানাটি পৃথিবীর একেবারেই নগণ্য জায়গা দখল করে থাকে। মানুষের আত্মার বিস্তৃতি এতই বিশাল যে, তাকে যদি একটা বিশাল পৃথিবীর সমান বড় মনে করা হয় এবং তার ভেতরে দশহাজার কোটি মহাবিশ্ব এবং অনন্ত শূন্য সাগর একত্র করে, এই আত্মারূপ পৃথিবী ভেতরে স্থাপন করা যায়, তবে এই মহাবিশ্ব এবং অনন্ত শূন্যতা আত্মারূপ পৃথিবীর এক কোণে একটি সরিষা দানার ন্যায় পড়ে থাকবে। আর সমস্ত জায়গা খালি পড়ে থাকবে।

এই আত্মার বসবাস ক্বলবের ভেতরে এবং সেই ক্বলবেই পরম অনন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের বাসস্থান আরশ রয়েছে এই মর্মে বলা হয়েছে "মোমেনের কল্বে আল্লাহ্র (আরশ) রয়েছে। যেখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলা'মিনের বাসস্থান্। উল্লেখ থাকে যে মোমেন এবং সাধারণ মানুষের ভেতরে পার্থক্য আছে। বিশেষ অনুশীলন দ্বারাই একজন সাধারণ মানুষ মোমেন বান্দায় পরিণত হতে পারে।

এই উক্তি শুনে কেউ হয়তো মনে করতে পারে, এটা একটা অসম্ভব কথা। কিন্তু অনুশীলনে অনেক অসম্ভব জিনিসও সম্ভব হয়। আত্মাকে জাগ্রত করার জন্য একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনুশীলন করলে চাক্ষুষ দেখা যাবে যে, আমি এখানে যা লিখলাম, আত্মা তার চেয়ে হয়তো আরো বড়।

আত্মাকে কিভাবে জাগ্রত করা যায়?

আত্মাকে পরিষ্কার করতে হলে, আত্মাকে আগে চিনতে হবে, তার বাসস্থান কোথায় জানতে হবে। মহানবী (সাঃ) ফরমায়েছেন, "মানব দেহের ভেতর এক টুকরা গোস্ত খন্ড আছে, যেটা পরিস্কৃত হলে মানব দেহের সম্পূর্ণ দেহটাই পরিষ্কার হয়ে যায় এবং যেটা নাপাক বা অপরিষ্কার থাকলে মানুষের সম্পূর্ণ দেহটাই নাপাক বা অপরিষ্কার হয়ে যায়।" "হুশিয়ার" এটার নামই হচ্ছে ক্বলব। অন্যত্র বলা হয়েছে, এই ক্বলবটাই হচ্ছে বান্দার ভেতরে আল্লাহ্‌র বাসস্থান।

এই ক্বল্‌বের ভেতর রয়েছে রুহ্ বা আত্মা। মহানবী (সাঃ) ফরমায়েছেন, "মানব দেহের ভেতরে এক টুকরো গোস্ত আছে, তার ভেতর রয়েছে ক্বল্‌ব, ক্বল্‌বের ভেতরে রুহু।" তিনি আরও ফরমায়েছেন, "মানুষ যখন পাপের কাজ করে, তখন তার রুহের ভেতর একটি একটি করে কাল দাগ লাগে অর্থাৎ অপরিষ্কার হয়ে যায়, এই রুহ্‌তে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি ফোটেনা। যেমন, আয়নার ওপরে কালি মাখানো থাকলে কোন ছবি ফোটে না।" এই মর্মে তিনি বলেছেন, "প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার করার জন্য একটি রেত আছে, আল্লাহ্‌র জিকির বা স্মরণই হচ্ছে ক্বল্‌ব পরিষ্কার করার রেত।"

কালেমা 'লা-ইলাহা'র ভেতরে ধারণাতীত শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে। কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র বিশেষ প্রক্রিয়ায় অভ্যাস করলে চুম্বক এবং লোহার ঘষার মত মানব দেহের ক্বলবে, আত্মার ভেতরে ধারণাতীত শক্তি সৃষ্টি হয় এবং এটা বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই হয়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, আমরা কি কারণে সূর্য থেকে তাপ ও আলো পাই। সূর্যের শরীরে রয়েছে প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপ ও প্রতি বর্গইঞ্চিতে আট কোটি মন চাপ। এই অসহ্য চাপ ও তাপের কারণে সূর্যের অনুগুলো অনবরত বিস্ফোরিত (Fusion) হয়ে আলো এবং তাপ বিকিরণ করে।

কালেমা লা-ইলাহার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা'তে রয়েছে অসহ্য তাপ এবং 'ইল্লাল্লাহ'তে রয়েছে অকল্পনীয় চাপ। যখন ক্বলবের ভেতর বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই কালেমার জিকির দ্বারা সজোরে ধাক্কা দেয়া হয়, তখন ক্বলবের অণুগুলো বিস্ফোরিত হয় এবং আত্মা তাতে অসীম শক্তির অধিকারী হয়। এভাবেই আত্মা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং সেই মহাশক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের সাথে মিলনের জন্য যোগ্য হয়। কি প্রক্রিয়ায় এই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অনুশীলন করতে হবে, তা মহাভুল ভাঙ্গানোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

মহাভুল ভাঙ্গানোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিন, যিনি সদাসর্বদা বিরাজমান,তার অস্তিত্ব আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তিনি হলেন অতিন্দ্রীয় সত্ত্বা। সুতরাং আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিনের সাথে মানুষের পরিচয় লাভ যেন তেন ভাবে, জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ নিয়ম অনুশীলন বা সাধনার মাধ্যমেই একমাত্র তাঁর সাথে পরিচয় লাভ করা সম্ভব। যেমন– যাঁকে সৃষ্টি করা না হলে, এ বিশ্বভুবনের কিছুই সৃষ্টি করা হত না, সেই মহানবী (সাঃ) স্বয়ং হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর যাবৎ বিশেষ নিয়মে ধ্যানমগ্ন থেকে তাঁর পরিচয় ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বিশেষ রিয়াজত বা সাধনার মাধ্যমেই হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তার দেহকে বিশ্লিষ্ট করে গাছের পাতায় পাতায় বিচ্ছুরিত করে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত বায়েজীদ বোস্তামি (রহঃ) জিকির করার সময় শত শত বায়েজীদে বিভক্ত হয়ে জিকির করতেন। এই যে, পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখী তাঁর পিঞ্জিরার অবয়ব খানা (ছায়া) নিয়ে মূলদেহ থেকে কেমন করে বিচ্ছিন্ন বের হয়ে যেতেন, তারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কি আশ্চর্য এই মহাসৃষ্টি!

সীমাহীন মহাবিশ্বের তথা মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব তার বিস্তৃতি যেন এক রহস্যময় কল্পকথা। দিবালোকে মহাকাশের দিকে তাকালে, দৃষ্টি গোচর হয় উজ্জ্বল ভাস্কর আর সীমাহীন নীল আসমান। অন্ধকার তারাভরা যামিনীতে চোখে পড়ে নিশাকর ও তাকে বেষ্টন করে রাখা অজস্র নক্ষত্ররাজি। মনে হয়, কোন শিল্পী যেন রঙের তুলি দিয়ে তার শিল্পকলাকে বিকশিত করে রেখেছেন। মহাসৃষ্টির ভেতর মানুষ এক রহস্যাবৃত আশ্চর্য সৃষ্টি। মানুষ সসীম জীব। সে তার সসীম জ্ঞান খাটিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তত্ত্ব দিতে চেষ্টা করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে যদিও আমরা এর যৎকিঞ্চিত অনুধাবন করতে পেরেছি তবুও আরও কতই না রহস্য অচেনা, অজানা রয়ে গেছে। মহাবিশ্ব থেকে যদি আমরা আমাদের ধারণকৃত ধরণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে সৃষ্টির অজস্র রহস্য এখানেও প্রত্যক্ষ করব। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে বস্তু কণার গঠন, আর এই কণার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বস্তুরাজি বা পদার্থ। ধ্যানমগ্ন তাপসীর ন্যায় স্থায়ী পাহাড়, পবর্তমালা, শ্যামল সবুজ বৃক্ষরাজির সমারোহ, প্রবাহমান বারিধারার কলতান, পাখীর কুজন ইত্যাদি সবই কোন মহাশিল্পীর অমরগাঁথা, সুপ্ত মনের

অভিব্যক্তি। এ সবই বস্তুপুঞ্জের (পদার্থের) পরিকল্পিত সুনিপুণ ও সুসজ্জিত বিন্যাস মাত্র। পদার্থ তাই যা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে অনুভূতি যোগায়। যেমন– একটি ফুলের অস্তিত্ব স্পর্শে, ঘ্রানেন্দ্রিয় দিয়ে তার সুরভি নিয়ে, চোখের মনিতে তার সৌরভ মেখে এবং তাতে সঞ্চিত মধু আস্বাদনে আমরা তার (পদার্থের) সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করে থাকি। এখন প্রশ্ন হল, এই পদার্থই বা কি এবং কিই তার গঠন কলাকৌশল?

পদার্থের অবস্থা ও তার কারণ

যার ওজন আছে এবং কিছু জায়গা দখল করে থাকে, তাই পদার্থ। আমরা স্বাভাবিক ভাবে জানি, পদার্থ অবস্থা ভেদে তিনভাবে থাকতে পারে। যেমন- কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। উদাহরণ স্বরূপ ০ (শূন্য) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি বরফ (কঠিন), শূন্য ডিগ্রির অধিক তাপমাত্রায় এটি তরল (পানি) এবং একশত ডিগ্রী ও তার উর্দ্ধ তাপমাত্রায় এটি বাষ্পাকার ধারণ করে। আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় লোহা কঠিন, ১৫৩৫°C (পনের শত পঁয়ত্রিশ) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটি তরল এবং এর চেয়ে অধিক তাপ মাত্রায় বাষ্পাকার ধারণ করে।

অধূনা জানা গেছে, এভাবে তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে বস্তু এমন এক পর্যায়ে এসে যায়, তখন বস্তু আর বস্তুতে থাকে না। যেমন- সূর্যের গায়ে কোথাও কোথাও তাপমাত্রা এক কোটি থেকে দু'কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস। এখানে সমস্ত বস্তুপুঞ্জ ভেঙ্গে ইলেকট্রন, ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট আয়ন, নিরপেক্ষ অণু এবং পরমাণুর মিশ্রণ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে প্লাজমা (Plasma) বলা হয়। মহাবিশ্বের ৯৯% এরও বেশী পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় আছে। অবশ্য পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই কঠিন, তরল বা বায়বীয়। কিন্তু এই বিশাল মহাবিশ্বের তুলনায় পৃথিবীতো একটি বিন্দুর চেয়েও নগন্য।

এখন প্রশ্ন হল বস্তুর অবস্থাভেদ হয় কেন? বস্তু অণুদ্বারা গঠিত। বস্তুস্থিত অণুগুলোর পরস্পরের প্রতি আছে প্রবল আকর্ষণ বল। একে আন্তঃআনবিক শক্তি (Intermoleculor Force) বলে। আর পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে আছে ফাঁকা জায়গা। একে আন্তঃআনবিক জায়গা (Intermoleculor Space) বলে। কঠিন পদার্থের বেলায় আন্তঃআনবিক আকর্ষণ সর্বাধিক এবং আন্তঃআনবিক জায়গা কম। এ অবস্থায় অণুগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অবস্থান করে কাঁপতে থাকে। যদি কোন বহির্বল (যেমন- তাপ, চাপ ইত্যাদি) এর উপর প্রয়োগ করা হয়, তখন অণুগুলোর কাঁপুনি বেড়ে যায়। ফলে , আন্তঃআনবিক জায়গা বাড়তে থাকে এবং আন্তঃআনবিক শক্তি কমতে থাকে। এ অবস্থা চলতে থাকলে, এক সময় বস্তু কঠিন থেকে তরলে পরিণত হয়। এভাবে তাপমাত্রা আরও বাড়ালে,বস্তুর আন্তঃআনবিক শক্তি একেবারেই শিথিল হয়ে যায়। ফলে, পদার্থ বায়ুচাপ ভেদ করে বাষ্পে পরিণত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বস্তু আর বস্তুতে থাকে না, সে

মৌলকণার নিয়ম ভেঙ্গে ইলেকট্রন (Electron), আয়ণ (Ion),নিরপেক্ষ পরমাণু (Neutral atom) অর্থাৎ শক্তিতে পরিণত হয়। আর এটাই বস্তুর প্লাজমা (Plasma) অবস্থা।

বস্তু ও শক্তির সম্পর্ক

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক তত্ত্বের (Theory of Relativity) সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, বস্তু আর শক্তিতে কোন প্রভেদ নেই। আসলে এটি একই জিনিসের দুই ভিন্নরূপ। তিনি বলেছেন, "এক আউন্স পরিমাণ বস্তুকে যদি সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা ৬০,০০০০ (ষাট হাজার) টন পেট্রোল পুড়িয়ে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, তার সমান। এটা আবার উল্টো দিক থেকেও সত্য অর্থাৎ ৬০,০০০০ টন পেট্রোল পুড়িয়ে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, তাকে যদি বস্তুতে পরিণত করা হয়, তাহলে পাওয়া যাবে এক আউন্স পরিমান বস্তু।

উল্লেখিত তত্ত্বটির সত্যতা আমরা আমাদের বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। আমরা শর্করা জাতীয় খাদ্য (যেমন-ভাত, রুটি ইত্যাদি) প্রতিনিয়ত খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকি। এই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য মুখনিঃসৃত টায়ালিন নামক রস কর্তৃক জীর্ণ হয়ে পাকস্থলী ও তৎপর ডিওডিনামে প্রবেশ করে। এখানে অগ্নাশয় কর্তৃক নিঃসৃত বা নির্গত রস (Panchcreatic juice) এর এমাইলাস (Amylas) দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে মল্টোজ শর্করায় পরিণত হয়ে ক্ষুদ্রান্তে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্তের নিঃসৃত আন্ত্রিক রসের মাল্টোজ (Maltose) কর্তৃক উর্দ্ধপাচ্য মল্টোজ জারিত হয়ে গ্লুকোজে (Glucose) পরিণত হয়। এই গ্লুকোজ, ক্ষুদ্রান্তের ভিলাস দ্বারা শোষিত হয়ে রক্তে মেশে। রক্ত শর্করা জ াতীয় খাদ্যের এই সার অংশ গ্লুকোজকে বয়ে নিয়ে দেহের প্রতিটি কোষে কোষে পৌঁছে দেয়।

আবার, আমরা বাতাস থেকে শ্বাস-প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন (Oxygen) গ্রহণ করি। বায়ুমিশ্রিত এই অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করলে, ফুসফুসের এ্যালভুলি দ্বারা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উহা রক্তের সাথে মিশে যায়। এই অক্সিজেন মিশ্রিত রক্ত হিমোগ্লোবিন হিসেবে হৃদপিন্ডে পাম্পকলের সাহায্যে মানুষের দেহের প্রতিটি কোষে কোষে পৌঁছে। কোষের শক্তিঘর (Power House) মাইটোকনড্রিয়াতে (Mitocondria) শর্করা জাতীয় খাদ্যের সারাংশ অর্থাৎ গ্লুকোজ ও অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে, অজস্র তাপ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তি দিয়ে পায়ের জানুতে ভর দিয়ে নিত্যদিনের কাজকর্ম সমাধা করে থাকি, এই শক্তি দ্বারা চোখের পাতা উন্মোচিত করে প্রিয়জনের অবয়বখানা দেখে নয়ন মনকে তৃপ্তি দান করে থাকি, হৃদপিন্ডের কর্মক্ষমতা লাভ করি ইত্যাদি।

আবার সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সৌরশক্তি ধরে নিয়ে প্রথমে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে এবং পরে রাসায়নিক শক্তি দ্বারা পানি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমন্বয়ে গ্লুকোজ (Glucose) সৃষ্টি করে। আমরা সহজে বলতে পারি, উদ্ভিদ সৌর শক্তিকে গ্লুকোজ বা বস্তুতে রূপান্তরিত করল। উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম, বস্তু থেকে শক্তি এবং শক্তি থেকে বস্তু সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বস্তু ও শক্তিতে কোন প্রভেদ নেই। এটি বস্তুর অবিনাশিতাবাদ সূত্রেরই সাক্ষ্য বহন করে। প্রশ্ন হ'ল, এই শক্তি কি এবং কিভাবে তার প্রয়োগে বস্তু থেকে শক্তি নির্গত করা যায়?

হৃদপিন্ড মানুষের অতি আশ্চর্য কারখানা

হৃদপিন্ড মানবদেহের একখন্ড মাংসপিন্ড যার গঠন ও কার্যাবলী দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই গোস্তখন্ডটি খুবই সংবেদনশীল স্থিতিস্থাপক কলা বা টিস্যু দ্বারা গঠিত যা মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার সংকোচন ও প্রসারণ নীতি ব্যবহার করে মানবের জীবনধারা প্রবাহমান রাখে। এর সচলতাই জীবন আর নির্জীবতায় মানুষ হয় প্রাণহীন জড়। কিন্তু একটা আশ্চর্য বিষয় এই যে, মানুষ সৃষ্টি হওয়ার সময় হৃদপিন্ড যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তা ছিল নির্জীব-নিশ্চল। এই গোস্তখন্ড হঠাৎ কখন চলতে শুরু করে, তা বিজ্ঞানীরা আজও আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি।

মানবদেহের এই যন্ত্রটিকে (হৃদপিন্ড) যদি সাগরের সাথে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নদী-নালা, খাল-বিলের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে সাগরে যেমন জোয়ার এলে নদী-নালা, খাল-বিল এমনিতেই ভরে ওঠে, তেমনি হৃদপিন্ডের কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা প্রতি কোষ, অণু, পরমাণুতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এই হৃদপিন্ডে প্রবাহমান তরল পদার্থের নাম রক্ত। রক্তে দু'টো ভাগ–একটি রক্ত রস অন্যটি রক্ত কণিকা– এই উভয় পদার্থই সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলকণার সমন্বয়ে গঠিত।

৭ম অধ্যায়

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জিকির বা মহাসাধনা

এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যথা– চাষী, কামার, কুমার, জেলে,তাঁতী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী, পন্ডিত ইত্যাদি প্রতিটি ভাববাদী মানুষ যেই হোন না কেন, সবারই অনন্ত জিজ্ঞাসা 'কে আমি'? কোথা থেকে আমি আসলাম? কোথায় আমি যাব? আর কেইবা আমার স্রষ্টা? আর এ অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর সে কোন বইপুস্তক পড়ে, পরীক্ষাগারে পরীক্ষা চালিয়ে, কোন দার্শনিকের নিকট গিয়ে পাবে না। এই উত্তর পেতে হলে দুনিয়ায় স্নেহ-মায়া এবং কর্মধারায় নিমজ্জিত মানুষটিকে গুটিয়ে নিয়ে তার নিজের ভেতর নিক্ষেপ করে, বিশেষ অনুশীলন বা সাধনার মাধ্যমে চেষ্টা চালালে হয়তো উত্তর পেতে পারেন। আর এরূপ সন্ধানকারী হলেন একজন জাকেরীন বা সালেক।

একজন সালেক বা জাকেরীন যখন জিকির করতে থাকেন, এক পর্যায়ে জিকির করতে করতে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামের একনিষ্ঠ অনুশীলন করতে করতে তার দেহে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা হালাত সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের আলোকে বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

একজন আল্লাহ্ প্রেমিক যখন তাকে (আল্লাহ্'কে) পাবার জন্য বা তার সান্নিধ্য লাভ করার ইচ্ছে করেন, তখন সেই প্রেমিককে দুনিয়ার কর্মকোলাহল, সংসারের মায়ার বাঁধন পেরিয়ে, নিরালায় একাগ্রচিত্তে, মনস্থির করে অর্থাৎ কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি এনে বিশেষ প্রক্রিয়ার আল্লাহ্‌র নাম সজোরে ক্বল্‌বে নিক্ষেপ করে অনুশীলন করতে হয়, যা এই বইয়ের শেষে লেখা আছে। উল্লেখ থাকে যে, ক্বল্‌ব হল মানব দেহের হৃদপিন্ডের বিশেষ একখন্ড গোস্তের টুকরা। উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় যা এই বইয়ের শেষে দেয়া আছে, একজন পারদর্শী অভিজ্ঞ লোকের নির্দেশ মোতাবেক জিকির করলে তার ক্বলবে পাঁচ প্রকারের শক্তি সৃষ্টি হয়।

প্রথমত

জিকিরে চাপ ও তাপের প্রভাবঃ জাকেরীন যখন 'ইল্লাল্লাহ্' শব্দ সজোরে ক্বল্‌বে নিক্ষেপ করে বা 'ইল্লাল্লাহ্' বলে মাথা দিয়ে ক্বলবে সজোরে ধাক্কা মারে তখন 'ইল্লাল্লাহ্' শব্দ ক্বল্‌বে প্রথমে চাপ ও পরে তাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ প্রয়োগের ফলে যে তাপ বা শক্তি সৃষ্টি হয়, তা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রেনো তার চাপীয় সূত্র দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এই সূত্র অনুসারে, স্থির আয়তনের কোন নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করলে, তার

তাপমাত্রা বেড়ে যায়। হৃদপিন্ডের আয়তন নির্দিষ্ট এবং এতে অবস্থিত গ্যাসীয় ও তরল পদার্থের পরিমানও নির্দিষ্ট। উল্লেখ থাকে যে, রক্তের মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই- অক্সাইড ও আরও অনেক গ্যাস মেশানো থাকে। এই গ্যাসীয় পদার্থে চাপ বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। জাকেরীন একাধারে যখন এভাবে জিকির বা আল্লাহ্‌র নামের চাপ হৃদপিন্ডে দিতে থাকে, ততই হৃদপিন্ডের তাপমাত্রা বেড়ে তা তরল পদার্থকে সঞ্চালন করে।

আবার, প্যাসকলের সূত্র অনুসারে, কোন আবদ্ধ নির্দিষ্ট তরল পদার্থের যে কোন অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ অপরিবর্তিত থেকে তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে চারিদিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং আবদ্ধ পাত্রের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে। তিনি আরও বলেছেন, কোন রাবারের বলে পিন বা সুচ দ্বারা ছোট ছোট ছিদ্র করে বলের ভেতর তরল পদার্থ (যেমন-পানি) দিয়ে যদি পূর্ণ করা হয়, দেখা যাবে, পানি ছিদ্র দ্বারা বের হচ্ছে না। কিন্তু বলটিকে যদি হাত দিয়ে চাপ দেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, ছিদ্র দিয়ে তরল পদার্থ বিপুল বেগে বেরুচ্ছে।

আমাদের হৃদপিন্ডে রক্ত নামক তরল পদার্থ বিদ্যমান। এই তরল পদার্থটি পাম্পকল হৃদপিন্ডের সরমাইট্যাল ভাল্ব ও ধমনী দিয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। জাকেরীনের জিকিরের চাপ যখন হৃদপিন্ডের এক বিরাট এলাকায় পরে, তখন তার প্রভাবে রক্ত সরু নালী দ্বারা তীব্র বেগে ছুটে চলে। এই তীব্র স্রোতধারা বিভিন্ন ভাল্ব যেমন অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা, নিলয়-ধমনী কপাটিকা,শিরা-ধমনী কপাটিকা এবং ধমনী গাত্রে আছড়িয়ে পরে, যার ঘর্ষণে তাপ উদ্ভব ঘটে অর্থাৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এজন্য দেখা যায়, জাকেরীনের জিকির করার সময় তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং তার রক্তপ্রবাহ দ্রুত হয়।

দ্বিতীয়ত

জিকিরে চুম্বকত্ব শক্তিঃ 'ইল্লাল্লাহ্‌' বা 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ' জিকির হৃদপিন্ডতথা কলবে 'জবর' বা ঘা দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে বলতে হয়। ফলে ক্বল্‌বের গোস্তখন্ডে ঘর্ষণ হয়। আর এই ঘর্ষণের ফলে গোস্তখন্ডটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যেমন- আমরা যদি দু'হাতের তালু কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করি, তাহলে দেখা যাবে যে, হাতের তালু গরম হয়ে উঠছে। তাছাড়া 'আল্লাহ্‌' নামে আছে এশ্‌ক নামক প্রচন্ড আকর্ষণীয় চুম্বক ক্ষমতা। এই আকর্ষণীয় চুম্বক ক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক দিয়ে নির্দিষ্টভাবে একটানা ঘষতে থাকলে, ক্বল্‌বটাও অনুরূপ চুম্বকত্ব লাভ করে কল্পনাতীত অসীম শক্তির আধারে পরিণত হয়।

যেমন- একখন্ড লোহাকে যদি একটি চুম্বক দিয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই দিক থেকে একাধিকবার ঘর্ষণ করা যায়, তাহলে লোহার টুকরাটাও স্থায়ী চুম্বকত্ব লাভ করে অর্থাৎ সেও অন্যান্য লোহাজাতীয় পদার্থকে আকর্ষন করতে সক্ষম হয়।

বিজ্ঞান বলে, চুম্বকের অণুগুলো নির্দিষ্ট সজ্জায় সজ্জিত অর্থাৎ চুম্বকের সমস্ত অণুগুলোর 'মাথা' একদিকে এবং 'পা' অন্য দিকে থাকে। কিন্তু লোহা বা লোহাজাতীয় চৌম্বক পদার্থের অনুগুলোর সজ্জা এলোমেলোভাবে সজ্জিত থাকে। একটি অণুর 'মাথা' অন্য অণুর 'পা' বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো থাকে। নির্দিষ্টভাবে ঘর্ষন করার ফলে এলোমেলো এই সমস্ত অণুগুলোর সবগুলোর 'মাথা' একদিকে এবং 'পা' তার বিপরীতে সজ্জিত হয়। ফলে, তার ভেতর আকর্ষণ ক্ষমতা জন্মে। ঠিক ক্বল্‌বটাকে যদি আল্লাহ্‌র এশ্‌ক নামক চুম্বক দ্বারা এলোমেলো ভাবে না বরে, একই নিয়মে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ঘর্ষন করা হয়, তবে এক সময় ক্বলবটা এশ্‌ক নামক চুম্বকত্ব লাভ করে কল্পনাতীত অসীম শক্তির আধারে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত

জিকিরে শক্তির তীব্রতা ঃ কোন উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো ফেললে, দেখা যাবে যে, লেন্সের ফোকাস বিন্দুতে তীব্র ও উজ্জ্বল আলোর সমাবেশ ঘটে। এই ঘনীভূত আলোর বা উজ্জ্বল আলোর বিন্দুতে শুকনো খরকুটা রাখলে দেখা যাবে যে, ঘনীভূত আলোর তীব্রতায় খরকুটায় আগুন ধরে গেছে। তেমনি জাকেরীনের (জিকির করার সময়) মস্তিষ্ক বা মনের মনিকোঠা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকশক্তিকে যদি ক্বল্‌বে সঠিক নিয়মে ফোকাস করা হয়, তাহলে একাগ্রচিত্ততায় ঘনীভূত রশ্মি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ক্বল্‌ব উদ্দীপ্ত ক্বল্‌বে প্রচুর তাপ বা শক্তি সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত

জাকেরীনের ইচ্ছা শক্তির তীব্রতা ঃ ইচ্ছা বা উইল ফোর্স, যেটি সম্মোহিত বিদ্যার আদি কথা। সম্মোহন বিদ্যার অনুশীলন মানুষের দেহে ও মনে অসাধারণ শক্তির উদ্ভব ঘটায় এবং এর ব্যবহারে সে বহু অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু এটি অর্জন করতে হলে তাকে কঠোর অনুশীলন ও সাধনা করতে হয়। যেমন - একজন লোক যদি কোন বোর্ডে পাশাপাশি তিনটি বৃত্ত এঁকে, তাতে যে কোন তিন ধরনের রং দিয়ে পূর্ণ করে এবং পলকবিহীনভাবে একটানা অধিকক্ষণ তার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে, তাহলে এমন এক সময় আসবে যে, সে তিনটি রংয়ের সমন্বয়ে অন্য এক ধরনের রং প্রত্যক্ষ করবে।

এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে লোকটির ইচ্ছাশক্তি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এমনি করে এমন এক সময় এসে যায় যে, সে ইচ্ছা করলে তার চোখের জ্যোতির তীব্রতায় একজন সাধারণ মানুষকে বেহুশ করে দিতে পারে। তাহলে দেখা যায় যে, চোখের বিশেষ অনুশীলনে একজন সম্মোহনবিদের আত্মিক শক্তির উন্নয়ন সম্ভব।

একজন জাকেরীন যখন জিকির করে, তখন সে তার দেহ, মন, প্রাণ, সর্বশক্তি নিয়োগ

করে, তার হৃদপর্দায় মন বা ইচ্ছাশক্তিকে নিবন্ধ রাখে। হৃদপর্দা এমন একটি স্থান যেখানে গায়েবের খবর ও ছবি ধরা পরে। হৃদপিন্ড হ'ল দেহের সব অঙ্গের শক্তির আধার বা ধারক। সে হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গসমূহকে শক্তি সরবরাহ করে সদাসর্বদা উজ্জীবিত করে রাখে। হৃদপিন্ডের অধীন অঙ্গ হ'ল চক্ষু, তার অনুশীলনীতে যদি মানুষের ইচ্ছা শক্তি এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তবে সম্পূর্ণ দেহের শক্তির আধার বা পরিচালক হৃদপিন্ডের অনুশীলনীতে যে ইচ্ছা শক্তির প্রবেশ্যতা কত বেশী হবে তা একজন অনুশীলনবিহীন লোককে ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। মনে রাখবেন, হৃদপর্দা এমন একটি জায়গা বা পর্দা যেখানে গায়েবের খবর প্রতিধ্বনিত হয় এবং গায়েবের থেকে আগত গামা রশ্মির মত অদৃশ্য রশ্মি ভেসে ওঠে।

এ ধরনের শক্তিধর জাকেরীন ইচ্ছাশক্তি (জিকির অবস্থায়) যখন দেহে সৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তার দেহ উচ্চ বিভবসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির আধারে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তার দেহ থেকে ইলেকট্রন বা শক্তি নির্গত হতে থাকে। তখন সে তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিশ্লিষ্ট শক্তিকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রেরণ করে কল্পনাতীত আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হন। উল্লেখ থাকে যে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুতে মুক্ত কিছু ইলেকট্রন থাকে। বহির্বল যেমন তাপ, চাপ ইত্যাদি দিয়ে এদেরকে বস্তু থেকে দূরে নিক্ষেপ করা যায়। আর এটাই হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স। মানুষ কিন্তু প্রায় সর্বমৌল মিশ্রিত একটি বস্তু। আর এই ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহারেই মানুষ পৃথিবী হতে চন্দ্রে রকেট চালনা ও রকেটের বিকল যন্ত্র মেরামতে সক্ষম হয়েছে।

উপরোক্ত চার প্রকারের উদ্ভুত শক্তি বা তাপ যা জাকেরীনের দেহে সৃষ্টি হয়, তা তার দৈহিক অনুশীলনের বা সাধনার ফলে সৃষ্টি হয়। এ ধরনের অনুশীলনের বা সাধনার ফলে জাকেরীনের ক্বলবটা একটা সূক্ষতম সত্ত্বা (আল্লাহ্‌র) ধরার ক্ষমতা অর্জন করে। এ সময় পঞ্চম প্রকারের শক্তি অর্থাৎ জাকেরীনের একাগ্রচিত্ততা, খেয়াল, এশ্‌ক (প্রেম) আল্লাহ্‌পাককে আকর্ষণ করে এবং আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিন নিজ দয়ায় প্রেমিক বা আশেক জাকেরীনের এশ্‌কের টানে, তার মেহনতে (জিকির) গড়া মসনদে উপবিষ্ট হন।

যেমন, একটি গাছের ভেতর ফল, ফুল লুকানো থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে এবং সময়ে গাছ থেকে মুকুল বের হয়। কিন্তু এ সময়তো মুকুলের ভ্রমর আকর্ষণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। মুকুল যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন ফুল থেকে সুরভি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর তারই আকর্ষণে ভ্রমর উড়ে এসে ফুলে বসে মধু আস্বাদন করে এবং গুণগুনিয়ে গান গেয়ে ফুলের তন্ত্রী তার অনন্ত ভালবাসা প্রদান করে, ফুলরূপ প্রেমিকার অনন্ত জ্বালা নিবৃত করে।

পঞ্চমত

পরম শক্তির আবির্ভাবঃ সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভুত শক্তি হ'ল স্বয়ং মহামহিম আল্লাহ্‌ পাকের অসীম মহাশক্তির আবির্ভাব। জিকির হল একাগ্রচিত্তে নিরিখ বা খেয়াল করে, মহব্বতের সাথে স্রষ্টাকে ডাকা বা স্মরণ করা। এখানে জিকিরে দু'টি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ নিরিখ বা খেয়াল, আর অন্যটি হল মহব্বতের সাথে স্মরণ করা বা ডাকা। নিরিখ বা খেয়াল হল জাকেরীন তার কাঙ্খিত বস্তুকে সামনে উপস্থিত বা হাজির জেনে তার দিকে একাগ্রচিত্ত হওয়া। এভাবে হাজির জেনে ডাকলে বা স্মরণ করলে তার অর্ন্তদৃষ্টি লক্ষ্য বস্তুতে প্রগাঢ় (Concentrated) হয় এবং এভাবে একদিন আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিনের অশেষ রহমত বর্ষিত হলে, তার কল্পনা বস্তবে রূপ লাভ করে।

কল্পনা যে বাস্তবে রূপ নিতে পারে, তা সহজে অনেকে মেনে নিতে চায় না। এদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি আমার একটি কথা। যার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্ত নেই, বেধ বা উচ্চতা নেই, শুধু অবস্থান আছে, তাকে বিন্দু বলে। আসলে বিন্দুর কোন সংজ্ঞা নেই। এটি একটি স্বীকার্য (Postulate) অর্থাৎ এটি একটি কল্পনার জিনিস। কিন্তু মনে রাখার বিষয় এই যে, বিন্দু দিয়েই রেখা, রেখা দিয়ে কোণ, তল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে। আর বিন্দু সর্বশেষ ফলশ্রুতি হল ত্রিকোণোমিতি, ক্যালকুলাস বা উচ্চ গণিতশাস্ত্র। ভিত্তিহীন, কল্পনার বিন্দু, যাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, তা দ্বারা উদ্ভাবিত ত্রিকোণোমিতি বা উচ্চ গণিতশাস্ত্র ব্যবহারে শূন্যে মহাকাশযানের দিক নির্দেশনা, দিগন্তহীন সমুদ্রে নাবিকেরা গন্তব্যস্থানের দিশা পায় বা দিক নির্ণয় করে, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি পরিচালিত হচ্ছে। তাহলে দেখা যায়, একটি কল্পনা বা মিথ্যা দিয়েই বিশ্ব আজ নিয়ন্ত্রিত। আর যিনি এই বিন্দুর জ্ঞানধারী ও বিন্দুর প্রয়োগকারীর স্রষ্টা, তিনি কিন্তু বিন্দুর মত মোটেই ভিত্তিহীন নন। তিনি সর্বদা বিরাজ মান, তিনি অলক্ষ্যে থেকে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে আপনার ভেতর শক্তি ফুঁকে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন না। কারণ তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য অনুশীলনের বা সাধনার মাধ্যমে তেমন কোন অঙ্গ বা (Organ) সৃষ্টি করেননি।

আল্লাহ্‌পাকের শক্তির আবির্ভাবের দ্বিতীয় শর্তটি হল, মহব্বতের সাথে তাকে ডাকা। ডাক হল একটি শব্দ যা মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে চেতনা বা সাড়া জাগিয়ে তাকে বিভিন্ন কর্মে উদ্দীপ্ত করে। যেমন- কোন লোকের ডাক বাতাসে ভেসে অন্য কারো কানের পর্দায় বারি খেয়ে মধ্যকর্ণে প্রবেশ করে। মধ্যকর্ণের তিনটি টেম্পরাল হাড়-মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপ্‌স কর্তৃক শব্দটি জোরালো হয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। অন্তঃকর্ণের শামুকের প্যাচের ন্যায় কক্‌লিয়ায় অবস্থিত পেরিলিম্ফে এই শব্দ তরঙ্গ, তরল তরঙ্গে পরিণত হয়। এই তরল তরঙ্গে অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্র ভাসমান আছে। তরল তরঙ্গ বৈদ্যুতিক সাড়া সৃষ্টি করে স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা জোগায় এবং এভাবেই আমরা ডাক বা শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু তরল তরঙ্গ শক্তি কিভাবে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তা আজও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার

করতে সক্ষম হননি। বিজ্ঞানী হেল্ম হোৎস এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

তাহলে আমরা দেখলাম, শব্দ বা ডাক মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তাকে বিভিন্ন কর্মে উদ্দীপ্ত করে এবং ডাকের সাড়া বা মর্ম অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। যেমন ঃ থানার দারোগাকে যদি কেউ ‘শালা’ এই অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়, তৎক্ষণাৎ দারোগার কানে শব্দটি সাড়া জাগিয়ে প্রতিক্রিয়া হিসেবে গালিদাতার পিঠ কষে দু'ঘা বেত মেরে দেয়। আবার কোন কুকুরকে আদর করে তার মনিব ডাক দিলে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে কুকুর মনিবের নিকট এসে তার দিকে ফ্যালফ্যাল নয়নে চেয়ে লেজ নাড়াতে থাকে। তাহলে দেখলাম, ডাকের মর্ম অনুযায়ী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়। আল্লাহ্‌পাক বলেন, “কোন বান্দা যদি মহব্বতের সাথে একাগ্রচিত্তে আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার অতি নিকটে যাই এবং আমার অসীম শক্তি দ্বারা বান্দার ক্ষুদ্র শক্তিকে উজ্জীবিত বা শক্তিশালী করে তুলি। ফলে, সে আমার সাথে সম্বন্ধ (Connection) জুড়ে দিতে সক্ষম হয়।” তখন সে আল্লাহ্‌র রংয়ে রঞ্জিত হয় এবং আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হয়।

যেমন ঃ একটি চুম্বক বলক্ষেত্রের ভেতর যদি এক টুকরা লোহা বা লোহা জাতীয় জিনিস রাখা যায়, তখন দেখা যায় যে, ঐ লোহার টুকরাও চুম্বকে পরিণত হয়ে গেছে এবং সেও অন্য লোহা জাতীয় জিনিসকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হল এই যে, সাময়িক আকর্ষণধারী লোহার খন্ডটিকে চুম্বক বলক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিলে, সে তার অর্জিত আকর্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একজন জাকেরীনের জিকিরে সন্তুষ্ট হলে তার স্রষ্টা মা'বুদ চুম্বকের ন্যায় বান্দার উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে কুদ্‌সিতে উল্লেখ আছে, যার অর্থ “আমার বান্দা এবাদত করতে করতে যখন আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়, আর যখন আমি বান্দাকে ভালবাসি, তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে এবং আমি তার দর্শনশক্তি হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে এবং আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে।” তাই বলে কেউ মনে করবেন না যে, বান্দা স্বয়ং আল্লাহ্‌ হয়ে যায়। একটি উদাহরণ দিলে জিনিসটি আরো পরিষ্কার হবে। লোহাকে আগুনে দিয়ে উত্তপ্তক রলে, এক সময় লোহা আর আগুনে কোন প্রভেদ থাকে না। অর্থাৎ লোহা আগুনের রূপ ধারণ করে। কিন্তু আগুনের কার্যক্ষমতা নষ্ট হলে অর্থাৎ আবার ঠান্ডা করলে, লোহা, লোহাই হয়ে যায়।

এরূপ অবস্থায় মা'বুদ স্বয়ং জাকেরীনের দেহরূপ গাড়ীখানার স্টিয়ারিংটা নিজ হাতে নিয়ে তাকে পরিচালনা করেন। আর উচ্চ বিভবসম্পন্ন শক্তির প্রভাবে পূর্বের জাকেরীনের জিকিরের দ্বারা অর্জিত শক্তি অসীম শক্তিতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি ফিউশন (Fusion) প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির সমতুল্য প্রায়। কারণ ফিউশন প্রক্রিয়ার একটি পরমাণু থেকে ৩টি নিউট্রন ও প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। আবার এই তিনটি নিউট্রন

অন্য তিনটি পরমাণুকে আঘাত করে। ফলে, ৯টি নিউট্রন ও পূর্বের চেয়ে ৯ গুণ শক্তি নির্গত করে অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় তাপ বা শক্তি জ্যামিতিক প্রগমন (Geometric Progression) এ বৃদ্ধি পায়।

ঠিক জাকেরীনের জিকির করার সময় একই পর্যায় অবলম্বনে তাপ বা শক্তি সৃষ্টি হয় বা উদ্ভব হয়। জাকেরীনের জিকিরের ফলে উপরোক্ত প্রথম চার প্রকারের উদ্ভুত শক্তি রক্তের মাধ্যমে বয়ে দেহের প্রতিটি কোষে কোষে অর্থাৎ জাকেরীনের মাথার চুলের ডগা হতে পায়ের আঙ্গুলের শেষ অবধি পৌঁছে। এই তাপের প্রভাবে রক্ত তথা কোষস্থিত অণুগুলো ফুটতে থাকে অর্থাৎ অনুগুলোর আন্তঃআণবিক শক্তি কমতে থাকে এবং আন্তঃআনবিক জায়গা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে পদার্থ, কঠিন থেকে তরলে পরিণত হয়। জিকিরের মাত্রা বেশী হলে, তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। ফলে, পদার্থের আন্তঃআনবিক শক্তি আরও শিথিল হয়ে যায় এবং আন্তঃআনবিক জায়গা আরও বেড়ে যায়। এক সময় বস্তু তাপ প্রাপ্ত হয়ে তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হয় অর্থাৎ এ সময় ক্বল্‌বটা আল্লাহপাকের অস্তিত্ব ধরার যোগ্যতা লাভ করে।

এরূপ অবস্থায় সর্বশেষে জাকেরীনের ভেতর যখন শেষ ও ৫ম শক্তি অর্থাৎ আল্লাহু রাব্বুল আ'লামিনের অসীম শক্তির উদ্ভব হয়, তখন প্রচন্ড তাপে পদার্থ আর পদার্থ থাকে না, সে মৌলকণার নিয়ম ভেঙ্গে ইলেকট্রন, আয়ন (Ion), নিরপেক্ষ পরমাণু (Neutral atom) অর্থাৎ বস্তু শক্তিতে পরিণত হয়। আর এটাই বস্তুর প্লাজমা (Plasma) অবস্থা। উল্লেখ থাকে যে, মানব দেহ গঠনে অনেক মৌলকণার সমাবেশ ঘটে যেমনঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, লোহা, তামা, ক্যালসিয়াম, দস্তা ইত্যাদি। উল্লেখিত প্রক্রিয়া সব মৌলকণার বেলায় প্রযোজ্য নয়। এগুলোর মধ্যে অধিক রাসায়নিক ক্রিয়াশীল অর্থাৎ ক্ষারকীয় পদার্থ যেমন ঃ সোডিয়াম, পটাশিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি প্লাজ মা অবস্থায় শক্তি নির্গত করে। কিন্তু ভারী মৌল যেমন ঃ লোহা, তামা, সোনা, দস্তা ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে।

তাহলে বলা যায়-প্রাথমিক অবস্থায় সে যখন জিকির করতে থাকে, তার হৃদপিন্ডের শক্তি বেড়ে চলে। যতই সে বেশী করে ক্বল্‌বে ঘা মেরে জিকির করতে থাকে, ততই উল্লেখিত চার প্রক্রিয়ায় শক্তি বা ক্ষমতা বাড়তে থাকে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে একজন সালেক (জাকেরীন) তার প্রতিটি লোম কূপের গোড়া থেকে ‘আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌’ শব্দ শুনতে পায়। আর শেষ শক্তির প্রভাবে (৫টি শক্তির সমন্বয়ে) জাকেরীন উচ্চ বিভবসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি বা অসীম ক্ষমতা লাভ করে। এর প্রভাবে তার ভেতর প্রচন্ড আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্ষমতা জন্মে। অতি উচ্চ বিভবসম্পন্ন বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি নিজেকে প্লাজমা অবস্থায় সৃষ্ট শক্তিকে হাজার হাজার মাইল দূরে শত শত ভাগে

ভাগ করে প্রকাশ করতে পারেন। আবার অতি উচ্চ বিভবসম্পন্ন বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা তার বিচ্ছুরিত শক্তিকে একত্রিত করে স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হতে সক্ষম। যেমন-হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) গাছের পাতায় পাতায় নিজেকে বিকাশ করে ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য রেখে গেছেন। আবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহঃ) জিকির করার সময় ঘর ভরে শত শত বায়েজিদে পরিণত হয়ে জিকির করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যকে এ অবস্থায় ধারালো ছুরি চালনা করার নির্দেশ দেন। তার হুকুম মোতাবেক শিষ্য যখন ঐ অবস্থায় ছুরি চালায়, ছুরি খানা পানিতে বা ছায়াতে আঘাত করার ন্যায় চলতে থাকে। জিকির শেষে দেখা গেল, শত শত বায়েজিদ বিলীন হয়ে গেছে আর আসল বায়েজিদ ঘরের এক পাশে বসে আছেন। উল্লেখিত ঘটনাগুলো বিজ্ঞানীদের প্রতিসাম্যের নিত্যতার সূত্রেরই প্রতিফলন মাত্র। এই নিয়মে বলা হয়, বিশ্বে 'বা' আর 'ডাইনের' মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ নেই কোন বস্তু আর তার প্রতিবিম্বের মধ্যে অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা জগতকে স্তম্ভিত করে একটি নতুন তত্ত্ব বা থিওরি দিলেন। এতে বলা হয়েছে, বস্তু এবং তার ছায়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এটি অত্যন্ত আশ্চর্য খবর এই যে, বস্তু ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, তাকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ছায়াকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা সেই থিওরীতে ছায়া আর বস্তুতে কোন প্রভেদ নেই এবং দু'টি জিনিস যে একই, তা আমাদের স্থুল জ্ঞানে ধরা পড়ে না।

অনুশীলনধারী সালেকের সাথে সাধারণ মানুষের তুলনা

এক ধরনের অনুশীলন বিহীন, সাধনাহীন তর্কবিদরা প্রশ্ন করতে পারেন, এ সব সেকালের কাহিনী ও কল্পকথা মাত্র, বাস্তবে এর কোন সত্যতার প্রমাণ নেই। এ ধরনের প্রশ্নকারীদের প্রতি কয়েকটি কথা। বি, এ, পাশের একটি সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য একজন লোককে দীর্ঘ বার বছর কঠিন অনুশীলনের বা সাধনার মাধ্যমে স্কুল, কলেজের নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে তা অর্জন করতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ কোন সত্য যাচাই করার জন্য পদ্ধতি মাফিক কতই না পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা করে লক্ষ্যে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করেন। একজন ব্যর্থ হলে, পরে অন্যজন তার অসমাপ্ত কাজ সমাধা করার জন্যে উঠে পরে লেগে যান। এভাবে কয়েকটি জীবনের কঠিন সাধনার ফলশ্রুতিতে চরম লক্ষ্যে তারা পৌঁছে যান। আর আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ) এর তত্ত্বগুলো নিয়ে জীবনে একটি বারও অনুশীলন বা সাধনা বা পরীক্ষা না করে, তত্ত্বগুলোকে অবাস্তব অলীক কল্পকথা বলে বসে আছেন?

অনুশীলন বা সাধনা (নিয়ম মাফিক কোন কাজ করা) মানব জীবনের অসাধ্য সাধন করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় অর্থাৎ অনুশীলন বা সাধনা ছাড়া কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। যেমন ঃ একজন সাইকেল চালক, বিমান চালাতে পারে না, তাকে বিমান চালাতে হলে, বিশেষ উচ্চ ধরনের অনুশীলনের বা সাধনার মাধ্যমেই তা শিখতে হবে।

একজন লোক তারের উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে পারে কিন্তু এর পেছনে আছে তার তীব্র অনুশীলন বা সাধনা। আবার এই অনুশীলন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে একজন মানুষের ছবিকে হাজার মাইল দূরে প্রেরণ করা। এখানে একটি আশ্চর্য কথা হল এই যে, প্রেরিত ছবিগুলো কিন্তু বাতাসে মিশে থাকে, খালি চোখে ওগুলো ধরা পরে না, একমাত্র টেলিভিশন নামক যন্ত্রটি অন করলেই ছবিটি দৃষ্টিগোচর হয়। আর সেই ছবি যা বাতাসে ভেসে থাকে বহু দূরে, তা 'এন্টিনা' যন্ত্রের সাহায্যে ধরে টেলিভিশনের পর্দায় ফেলে। আজ থেকে দু'একশ বছর আগে কেইবা জানত যে, এভাবে ছবিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠান সম্ভব।

সমসত্ত্ব (Homogenious) বলতে একটা কথা আছে। কথার সহজ অর্থ হল, একটি জিনিসের সাথে সমপ্রকৃতির অন্য একটি জিনিসের মেশার ক্ষমতা। যেমনঃ তেলের সাথে পানি মেশে না, এটা অসমসত্ত্ব অর্থাৎ সমপ্রকৃতির জিনিস পরস্পর সাথে মিশে যাওয়াই সমসত্ত্ব। একটি মোটা বেতকে যদি বাতাসে ধরা হয়, তাহলে তা থেকে কোন শব্দ পাওয়া যাবে না। আর যদি বিশেষ প্রক্রিয়ায় বেতটাকে পাতলা করে বাতাসে টেনে ধরা যায়, তবেই তা থেকে শব্দ শোনা সম্ভব হবে। বাতাস যেমন হাল্কা, বেতটাকে তেমনি পাতলা করলে, বাতাসের নিরব ধ্বনি বেত বুকে ধরে তার সমবেদনা অনুভব করতে পারে এবং সমবেদনায় নিজেও ঝংকার তুলে ঝংকৃত হতে থাকে। ওয়ারলেস (Wireless) এ খবর নেয়ার জন্য উঁচুতে শব্দ তরঙ্গ ধরার জন্য সমপ্রকৃতির যে বিশেষ পর্দা ব্যবহার করা হয়, তা এরই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব অনুভব করতে হলে বিশেষ শিক্ষকের নিকট থেকে নিয়মকানুন (Process) শিখে বেশ কিছুদিন অনুশীলন করলে, তার হৃদপটের পর্দায় তা অনুভব করা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে, শুধু মুখের কথায় চিড়া ভেজেনা, এর জন্য পানির প্রয়োজন।

আল্লাহ্পাক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সত্ত্বা। তিনি সদাসর্বদা বিরাজমান। ফিলোসোফির মতে তাঁর সূক্ষ্মতম সত্ত্বাকে অনুভব করতে হলে সূক্ষ্মতম যন্ত্র সেট করতে হবে। আমাদের ক্বলবের পর্দা বেতের মত মোটা। এ পর্দায় আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব ধরতে পারে না। কিন্তু বিশেষ নিয়মে জিকির (সাধনা) করলে জাকেরীনের হৃদপর্দা বেতের ন্যায় পাতলা হতে থাকে। ফলে, গায়েবের খবর সে ধরতে পারে অর্থাৎ তার ক্বল্‌ব উৎড়াতে থাকে। ফলে, পরমাণুর অন্তঃস্ফুরোণ শুরু হয়। অবশেষে বান্দা উচ্চ বিভবসম্পন্ন বিশেষ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা লাভ করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সত্ত্বা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ধরার যোগ্যতা অর্জন করে। যেমন- লোহা আগুনে দিলে, আগুনের রূপ ধারণ করে কিন্তু লোহা আগুন নয়।

যুক্তিতর্ক ছেড়ে আপনি এই বইয়ের শেষে দেয়া নিয়মানুযায়ী (একজন প্রাকটিক্যাল

শিক্ষকের কাছে বাস্তব অনুশীলন শিখে) সবক করে দেখেন। দেখবেন, যেদিন সত্য আপনাকে হাতছানি দিয়ে তার আসল রূপখানা প্রত্যক্ষ করাবে, সেদিন আপনি আপনার আসল সত্ত্বার সন্ধান পেয়ে মহানন্দে নৃত্য করে উঠবেন।

কোন বিজ্ঞানীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা একটি থিওরি (তত্ত্ব) একজন পরীক্ষা না করে শুধু মুখস্থ করে নিজেকে মহাপন্ডিত মনে করে বসে আছেন। আর একজন কম শিক্ষিত লোক সেই থিওরিটি উপলব্ধি করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বাস্তবে রূপদান করল। এখন থিওরি মুখস্থ করা মহাপণ্ডিত লোকটি যদি অনুশীলনরত, বাস্তব উপলব্ধি সম্পন্ন লোকটিকে ভ্রান্ত বলে অবহেলা করে, তবে ব্যাপারটি কিরূপ দাঁড়ায়? যেমন - একজন এম, এ, পাশ মানুষ জানে, দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিশালে পানি হয়। আর মেট্রিক পাশ একজন বিজ্ঞানের ছাত্র ল্যাবরেটরীতে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে যদি দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে পানি তৈরী করে বাস্তবে তা দেখাতে পারেন, তবে এম, এ, পাশ পন্ডিত ও মেট্রিক পাশ ছাত্রের জ্ঞানের অভিজ্ঞতা কি একরূপ হবে?

সমাজে অনেক আমিত্বধারী পন্ডিত ব্যক্তি আছেন, যারা মহাকালের মহাপণ্ডিত ও মহাসত্যবাদী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্বকে শুধু মুখস্থ করে যদি বাস্তবে উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সাথে অবজ্ঞা করেন, তাহলে তাদের অবস্থা কি এরূপ নয়?

আল্লাহ্‌রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব বোঝার জন্য একটি বিশ্ব চ্যালেঞ্জ (The World Challenge)

সব জিনিস জ্ঞান এবং যুক্তিতে ধরা পড়বে না, অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেক জিনিস অর্জন করতে হবে। যেমন- প্রসবব্যথা, সাপের কামড়ের বিষের জ্বালা, বিচ্ছেদ-বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, অসুখ-বিসুখের দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি। কেউ জ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবে না, অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে হবে। যেমন-সাপের কামড়ের জ্বালা বুঝতে হলে, সাপের কামড় খেয়ে বুঝতে হবে, প্রেমে পড়ে বিচ্ছেদ-বেদনা উপলব্ধি করতে হবে।

এমনিভাবে আত্মাকে জাগ্রত করতে হলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বুঝতে হলে, বিশেষ প্রক্রিয়ায় সাধনা করে তবে বুঝতে হবে। আমি যা লিখছি, তা কোন কিচ্ছা-কাহিনী নয়। এখনই আপনি বই ছেড়ে বসুন এবং ডান দিকের সবকের অধ্যায়ে যে প্রক্রিয়া লিখে দেয়া হয়েছে, তা কিছুদিন পরীক্ষা করে দেখুন। বিশেষ প্রক্রিয়া এই কারণে বলা হয় যে, বিশেষ উদ্দেশ্য কোন বিশেষ প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য উপায়ে কোন মতেই অর্জন করা সম্ভব হবে না। যেমন-আমরা জানি লোহার সাথে চুম্বক ঘষলে লোহাও চুম্বকত্ব লাভ করে। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ঘর্ষণ করতে হবে। চুম্বক দ্বারা যেমন-তেমন ভাবে লোহাকে ঘষলে লোহা চুম্বকত্ব পাবে না। কেননা, বিজ্ঞান বলে, লোহার অণুগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো এবং চুম্বকের অণুগুলো একই দিকে সুবিন্যস্ত। এখন যদি চুম্বক দিয়ে লোহাকে উল্টাপাল্টা ঘর্ষণ দেয়া হয়, তাহলে লোহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হবে না বা কাউকে সে আকর্ষণ করবে না। আর চুম্বককে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ একদিক থেকেই অন্যদিকে অনবরত ঘর্ষণ করা হয়, তাহলে লোহার অণুগুলো ক্রমে ক্রমে একই দিকে সুবিন্যস্ত হবে এবং লোহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হবে এবং লোহাও তখন চুম্বকের ন্যায় অন্যান্য লোহাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করবে।

এমনিভাবে সকল মানুষ দেখতে একই রকম, আকার-আকৃতির কিন্তু সাধনা ও অনুশীলনে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রকার বিভিন্ন হয়ে উঠে। একই মা'র দু'টি যমজ সন্তান দেখতে একই রকম, জ্ঞান-গম্যিও একই রকম। একজন যদি জ্ঞানের অনুশীলন করে এবং লেখাপড়া শিখে, তাহলে সে বিশ্বজোড়া একজন খ্যাত-নামা বৈজ্ঞানিকও হতে পারে

অথবা কোন কবি, দার্শনিক বা প্রকৌশলী ইত্যাদি হতে পারে। কিন্তু তার যমজ ভাইটি লেখাপড়া না শেখার দরুণ এবং জ্ঞানের অনুশীলন না করার দরুণ হয়তো মুর্খ হয়ে শ্রমিক হয়ে থাকে।

এই যে, একই মায়ের যমজ একটি ছেলে লেখাপড়া শিখে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সুদীর্ঘ ক'টি বছর পরিশ্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করল, তাতে দেখা গেল, তার যমজ অন্য ভাইয়ের চেয়ে একটি হাত, পা, মাথা, চোখ, কান বা দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম বেশী হয়নি। তার এই কঠিন সাধনায় যে জিনিসটি অর্জিত হয়েছে, তা হল 'জ্ঞান', যা ধরা ছোঁয়া বা বাস্তবে উপলব্ধি করার জিনিস নয়। আর সেই জ্ঞান অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে সে দুনিয়াজোড়া একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। আর একই মায়ের অন্য যমজ ছেলে, যে জ্ঞানের অনুশীলন করেনি, সে শুধু দিনমজুর হিসেবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে জীবন অতিবাহিত করল।

এই জ্ঞানকে অনুশীলন করতে একজন মানুষকে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সাধনা করতে হয়। মোটামুটি একজন মানুষকে এম, এ, পাশ করতে স্বাভাবিকভাবে ষোল বছর কঠিন সাধনা বা পরিশ্রম করে এবং তার এই জ্ঞান অনুশীলনের ধারা শিখতে হলে একজন অনুশীলনকারী বা শিক্ষকের নিকট শিখে তবে সে এম, এ, পাশের একটা সার্টিফিকেট পেতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই সে বলতে পারে না যে, আমার এম, এ, পাশের সার্টিফিকেটটা কই?

প্রকৃতির রহস্যের এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। গাছ বুনলে একদিনেই কখনো ফুল হয় না, বীজ বুনে তাতে একদিনেই ফুল ধরে না, চন্দ্র উঠলেই একদিনেই পূর্ণিমা হয় না। প্রতি ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে, দিনে দিনে একটা জিনিস পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন-ফুল প্রথমে কুঁড়ি হয়। সেই গাছের গোড়ার পানি ঢালতে ঢালতে এই কুঁড়ি ফুল হয় এবং ক্রমাগতভাবে তার ভেতর মধু এবং সুরভি সৃষ্টি হয়। এই ফুলের মধু এবং সুরভিই ভ্রমরকে তার বুকে ডেকে আনে, তারপর ফলের সৃষ্টি হয়।

ভ্রমর কোনদিন অফুটন্ত কলির বুকে বিহার করে না। ফুলের মধ্যে যখন মধুর সৃষ্টি হয়, মধুই তখন ভ্রমরের সাথে ফুলের সংযোজনকারী মিলনের দূত হয়ে দেখা দেয়। এরকম বিশেষ প্রক্রিয়ায় সাধনা করলে মানুষের আত্মার ভেতরে এক প্রকার কিম্‌তি জি নিসের সৃষ্টি হয় এবং সেটাই মানুষের আত্মার সঙ্গে আল্লাহ্‌র মিলনের দূত হিসেবে দেখা দেয়।

শিশুকালে একটি ছোট ছেলে প্রেম বা ভালবাসা বোঝে না এবং সে যুবতী নারীর অনুসন্ধানও করে না। কিন্তু খাদ্য ও পানীয় দ্বারা এই শিশুকে বড় করে তুললে কালে কালে যখন বিশ বছরের যুবক হয় এবং তার ভেতরে এমন একটা জিনিসের সৃষ্টি হয়, যা একটা যুবতী নারীকে তার বুকে টেনে নিয়ে আসে। এইভাবে তাৎক্ষণিকভাবে সব জ ায়গায় সব জিনিসের ফল লাভ করা সম্ভব হবে না। অনুশীলন এবং অপেক্ষার মাধ্যমে অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান একা একাই হয়ে যাবে।

সমস্যা যত কঠিন, উদ্দেশ্য যত দুর্ভেদ্য, চেষ্টা এবং অনুশীলনও ঐরকম কঠিনতর হতে হবে। মহাবিশ্বের মহাস্রষ্টাকে আবিষ্কার করা, তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করা এবং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা যেমন দুরূহ একটা সমস্যা, তার সমাধান করতে হলে চেষ্টা এবং অনুশীলনও তেমনি বিশেষ রকম হওয়া দরকার। যারা চেষ্টা না করে, অনুশীলন না করে, আল্লাহ্‌র নাম শুনেই বলে যে, আল্লাহ্‌কে দেখাও, তার অস্তিত্ব এখনই দেখাও। তাদের অবস্থা ঐ বুদ্ধ কেদারীর মত।

কেদারী নামে একটা হাবা কিছিমের লোক ছিল। সে জানত বিয়ে করলেই ছেলে হয়। তার একটা ছেলে পাওয়ার আস্ত একটা আশা হয়ে গেল। গ্রামের বলাই মাতব্বর তার মুরব্বী হয়ে তাকে বিয়ে করাতে গেলেন। বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর বাড়ীতে সে রাত্রিতে বৈঠকখানায় শুয়ে থাকল, বৌ থাকলো বাড়ীর ভেতরে শুয়ে। রাত কেটে গেল, পরদিন সোনালী ভোরে যখন পাখী ডাকল, কেদারী ভাইয়ের বউ নিয়ে রওয়ানা দেয়ার সময় হ'ল। বউ বের হয়ে এল। বন্ধুরা বলল, "কেদারী চল এখন বউ নিয়ে বাড়ী যাই।" কেদারী ভাই খুশি হয়ে একবার বউ এর দিকে নজর করে, আবার বউয়ের পেছনের দিকে, আবার তার কোলের দিকে নজর করে। সবাই বলে, কেদারী ভাই, বউয়ের কোলের দিকে এত তীব্র নজর কর কেন? গম্ভীর হয়ে কেদারী ভাই উত্তর দিল, "কই আমার ছেলে কই?" সবাই অবাক হয়ে বলল, "ছেলে আবার কিসের?" বিড়ি টানতে টানতে কেদারী ভাই উত্তর দিল, "কেন কাল রাত্রে যে কলেমা পড়ে বিয়ে করলাম। সবাই বলে, বিয়ে করলেই ছেলে হয়, আমার নছিবটাই মন্দ।" বন্ধুরা তাকে বুঝিয়ে বললো, বিয়ে করলে ছেলে হয় বটে কিন্তু সময় এবং খাটুনি লাগবে তো।

সমাজে অনেক অনেক কেদারী ভাই আছে, যারা কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা শুনে কোন প্রশ্ন করে না। এম, এ, পাশ করতে ষোল বছর যে সময় লাগে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে না। অবনত মস্তকে এই ষোলটি বছর পড়াশুনা করে যায়। তারা শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হয়েই তাৎক্ষণিকভাবে এম, এ, পাশের সার্টিফিকেট পেতে চায় না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা শুনলেই তারা তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌কে দেখতে চায়, এসব তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা কি কেদারী ভাইয়ের দোস্ত নয়? নাস্তিকদের অপর নাম কেদারী ভাই।

এই বইয়ে আমি সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করছি, যারা বলে আল্লাহ্ নেই, আখেরাত, কুর'আন, বেহেশ্ত, দোজখ, মহানবী (সাঃ)-কোন কিছু সত্য নয়, এই বইয়ের সবক অধ্যায়ের সবকগুলো কিছুকাল সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় অনুশীলন করে দেখুন, তারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনকে ধ্রুবভাবে অনুভব করতে পারবেন (ইনশা-আল্লাহ্)।

এই সবক করলে কি ফলাফল হবে, তাও লিখে দেয়া হয়েছে। এখন একটা কথা হচ্ছে, আপনার অনুশীলন সঠিক হচ্ছে কিনা তা এ লাইনের একজন শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিলে ভাল হয়। কারণ, আপনার সবক অনুশীলন করা যদি সঠিক না হয়। তাহলে আপনি অভিষ্ট লাভ করতে পারবেন না এবং আমাকেও দোষারোপ করবেন।

সবক
The Lesson

সবক করার নিয়ম

ভাল উৎপাদন পেতে হলে ভাল ভাবে জমি চাষ করে নিতে হয়, মরণের খেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্র বাস্তব জ্ঞান (Practical) বা মা'রেফত অর্জনের জন্য জমি চাষতুল্য। হাদিস শরীফে আছে, "আকিছিরুজ জিক্রা হাদামুল লাজ্জাত"-তোমরা অধিক পরিমাণে স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। আরও আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যাক্তি দিনে বিশ বার মরণকে স্মরণ করে, তার শহীদের চেয়েও বেশী নেকী হয় (বুখারী শরীফ)।

সবক আরম্ভ করার পূর্বে প্রথম দিন দু'রাকায়াত শোকরানা নামাজ আদায় করে আল্লাহ্র দরবারে যাবতীয় গুনাহ মাফ চেয়ে দো'য়া করবেন। মাবুদ এই গোলামকে আপনি কবুল করে নিন, এই তরিকার সমস্ত নেয়ামত এ গোলামের নছিব করুন। মাগ্রিবের ফরজ সুন্নত নামাজ আদায় করার পর, ছয় রাকায়াত আউয়াবিনের নামাজ আদায় করে তারপর শোকরানা নামাজ পড়বেন। শোকরানা নামাজের পরে পাঁচবার দরূদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করবেন। তারপর একটা নিরালা স্থানে চক্ষু বন্ধ করে মন স্থির করে বসবেন। বসে নিম্নলিখিত কায়দায় মরণের খেয়াল করবেন।

চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন। এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন, মন তুমি মরবে কি না? মন উত্তর দিবে, মরব। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে, না কবরে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ বাদে কেহ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন। খুব নিবিড়ভাবে খেয়াল করবেন, আমি এখন মরে গেলাম। আমাকে চারজন লোক ধরাধরি করে দুয়ারে এনে রাখে। এখন আমাকে গোসল দেয়। খেয়ালের নজরে দেখবেন, গোসলের পানি দুয়ারের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, আপনার অবুঝ সন্তানেরা সেই পানিতে খেলা করে। আপনার বিবি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে, চোখের পানিতে সে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে এপিঠ ওপিঠ করে গোসল দেয়া হচ্ছে। এবার আপনার জন্য কাফনের কাপড় এনে পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কাফন দেওয়া হচ্ছে। এখন কাফনে

মোড়ানো আপনি দুয়ারে অসহায়ভাবে শুয়ে আছেন আসমানের দিকে মুখ করে। এখন আপনার বিধবা বিবি আপনার দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদে। খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার বিধবা বিবিকে হাতের চুড়িবিহীন অবস্থায় দেখলে কেমন দেখা যায়। এসব কল্পনা করলে দেখবেন দেল (মন) নরম হবে।

সবকে বসার কায়দা

চারজানু হয়ে বসে বাম পায়ের কিমিয়াস রগকে ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল দিয়ে খুব চেপে ধরবেন। বাম পায়ে হাটুর নীচের দিকে যে মোটা রগটা আছে, তাকে কিমিয়াস রগ বলে। এই রগ দিয়ে শয়তান চলাফেরা করে, ঘাড়ের নীচে গোল হাড়ে আশ্রয় নেয়। এই রগটা জোরে চেপে বসলে শয়তানী খেয়াল দূর হয়। এই রগটা চেপে বসলে জেকেরে তাড়াতাড়ি তাছির হয়। মেয়েলোক নামাজের আসনে বসে জিকির করবেন।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য লাভের সবকসমূহ

প্রথম সবক

তারপর যে কোন দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়বেন। এই সময় খেয়াল করবেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর দরূদ পড়ি। যদি পারেন নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়বেন

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া নাবিয়েনা ওয়া শাফিয়েনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।"

দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়ার পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' এগার বার পড়বেন। যদি পারেন নিম্নোক্ত আসতাগফিরুল্লাহ পড়বেন খেয়াল করবেন, আমি যাবতীয় গুণাহ্ হতে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই।

"আসতাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম"

এরপর হাতে একটা তসবিহ্ নিয়ে পড়বেন

সোব্হানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই সময় খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন? হাদীস শরীফে আছে, বান্দা একবার আল্লাহ্‌কে ডাক দিলে, তিনি দশবার জবাব দেন। এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় লফজ মানে খেয়াল না করে প্রতিবারই খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও কেন বা কেন ডাক? এবং প্রতিবারই কানে আল্লাহ্‌র ঐ জবাব শুনতে চেষ্টা করবেন। একদিন ইন-শা-আল্লাহ্ দেলের কানে স্পষ্ট শুনতে পাবেন, আল্লাহ্ কেমন করে উত্তর দেন।

তারপর **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** ৫০০ (পাঁচশত বার)

দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন, **"আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই"**।

“লা” শব্দ বলার সময় মুখখানা ডানদিকে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের উপর নেবেন, ডান কাঁধের উপর হতে ‘লা’ শব্দ উঠাবেন, ইলাহা বলতে বলতে মাথাটা খাড়া রেখে বাম দিকে ঘুরিয়ে আনবেন, নাকটা যখন বাম দুধের বোটা বরাবর আসবে, বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, তখন খাড়া মাথাকে ‘ইল্লাল্লাহ্’ বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, ‘ইল্লাল্লাহ্’ গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, ‘ইল্লাল্লাহ্’ যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। মাথা খুব ঘন ঘন আছাড়-পিছাড় করবেন না শুধু উঠানামা করাবেন মাঝে মাঝে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)’ বলবেন। আর যদি সবকে এস্ক লেগে যায়, তবে একেবারে শেষে কয়েকবার বলবেন। পরে **পাঁচ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত দেবেন। মাগরিব বাদ ছয় রাকাত আউয়াবিন নামাজ আদায় করে এই সবক করবেন, না পারলে এশা বাদ, না পারলে শোবার আগে কোন সময় ওজু ছাড়াও করতে পারবেন, ফজর বাদ আরেকবার এই সবক করে বেলা উঠলে ছয় রাকায়াত এশরাকের নামাজ আদায় করবেন। হাটতে, চলতে, তসবীহ্ ছাড়া, ওজু ছাড়া, আন্দাজে- অনুমানেও এ সবক আদায় করতে পারবেন।

এই সবকের নিম্নমানের তাছির (Result) এই হবে যে, দেল পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা চোখে পানি ঝরবে, লোকের সঙ্গে অযথা আলাপ করতে ইচ্ছে করবে না, গুণাহের কাজে মন যেতে চাইবে না পীরের জন্য মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, তাকে দেখতে ইচ্ছে করবে তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগবে আর আখেরাতের চিন্তা মনে ঢুকে যাবে। পুরুষেরা শব্দ করে এবং স্ত্রীলোকেরা নিম্ন স্বরে, নিজে কানে শুনে এভাবে জেকের করতে হবে।

প্রথম প্রথম এই সবক করতে গেলে উজান ঠেলতে হবে, লোকে সমালোচনা করবে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেয়া নিস্প্রয়োজন, কারণ একের কবরে অন্যে যাবে না। সবকের সময়ে কু-খেয়াল অথবা সবকে তাছির না হলে, বামদিকে ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম’ পড়ে থু থু করে শব্দ করতে হবে (থু থু ফেলার দরকার নেই)। সবকে তাছির না হলে অথবা সবক করতে মনে যদি না লয়, তবে জোর করে মাত্রা বাড়িয়ে সবক আদায় করতে হবে। জোর করে মিষ্টি খাওয়ালে কি মুখে মিঠা লাগে না? জোর করে ওষুধ খেলে কি বিমারি ভাল হয় না? আল্লাহ্‌র নাম যাতে মুখে না উঠে, তার জন্য শয়তান অনবরত পেছনে তো লেগেই আছে, একথা যেন মনে থাকে।

দ্বিতীয় সবক

নফি এছবাত বা বার তস্‌বির সবক

এই সবকে বসে প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রেখে প্রথম সবকের মত মরণের খেয়াল করবেন এবং মনকে বুঝিয়ে বলবেন যে, কত মানুষ কবরে গেল, তোমাকেও কবরে যেতে হবে! মরণের পরে অনন্তকালের জীবনে যার সঙ্গে থাকতে হবে, দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা করে না গেলে, অন্ধকার কবরে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে! এইভাবে উত্তমরূপে মরণের খেয়াল করে পড়বেন ঃ

দরূদ শরীফ-	৫ (পাঁচ বার)
আসতাগফিরুল্লাহ-	১১ (এগার বার)
সোবহানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় প্রত্যেকবারই খেয়াল করবেন, “আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়া কয় (বলেন), বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন”। যদি কোন সময় পূর্ণ একশো বার নাও বলতে পারেন, তবে ‘সুবহানআল্লাহ্’ তেত্রিশ, ‘আল্হামদুলিল্লাহ্’ তেত্রিশ, ‘আল্লাহু আকবার’ চৌত্রিশ বার বলবেন। কিন্তু হালকায়ে জিকিরের দিন পূর্ণ একশত বার করে বলতে হবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ২০০ (দুইশত বার)
দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন- **আল্লাহ্ বাদে কেহ মা’বুদ নাই**।
অথবা যদি কেহ পারেন, তবে নিম্নোক্ত খেয়াল করতে পারেনঃ

‘লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ্-লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাশুকা ইল্লাল্লাহ্’ অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন, যখন “লা” শব্দ বলবেন তখন খেয়াল সাত তবক আসমানের উপরে নিয়ে দেখবেন, কোথাও আল্লাহ্ নেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেয়াল জমিনের দিকে আনবেন এবং হাজার হাজার মাইল জমিন সব ঘুরে আসবেন এবং খেয়ালের দৃষ্টিতে দেখবেন জমিনেও আল্লাহ্ নেই অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন “লা” শব্দ যখন বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন, জমিন নেই, আসমান নেই, আমার শরীরও নেই, কিছুই নেই, শুধু আল্লাহ্ই আছেন।” এখন আল্লাহ্ কোথায় আছেন, হাদিস শরীফের মতে ক্বল্‌ব হল আল্লাহ্‌র আরশ সুতরাং এখন খেয়াল কল্‌বের দিকে নেবেন এবং একিনের চক্ষু দ্বারা ক্বল্‌বের দিকে নজর করলে দেখবেন, আমার ক্বল্‌বে আল্লাহ্ই

আছেন। অথবা অন্য রকম খেয়ালও করতে পারেন “বেহেশ্‌ত দোজখ আরশ কুরছী লওহ্ কলম সাত তবক আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ্ নেই, কিন্তু একিনের চক্ষু দিয়ে ক্বল্‌বের উপরে নজর করে দেখবেন, আল্লাহ্ আমার ক্বল্‌বেই আছেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এই সমস্ত খেয়াল না করা ভাল। তারা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর” অর্থ খেয়াল করবেন, “আল্লাহ্ বাদে কেহ মা’বুদ নাই।” প্রথম সবকের নিয়ম অনুযায়ী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন। তারপর-

ইল্লাল্লাহ্- ৪০০ (চারশত বার)

ইল্লাল্লাহ্‌র মানে খেয়াল করবেন, **“আমার ক্বলবে আল্লাহ্‌ই আছেন”**।
বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, খাড়া মাথাকে ‘ইল্লাল্লাহ্’ বলে সজে ারে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, ‘ইল্লাল্লাহ্’ গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, ‘ইল্লাল্লাহ্’ যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। আকায়েদের মাসআলা নিয়ে বেশী হুলাহুলি করবেন না, তাহলে সবকের আসল মর্ম বুঝতে পারবেন না। শুধু আকায়েদই হাসিল হবে, আল্লাহ্ হাসিল হবে না। কারন, যুক্তিতে তাকে পাওয়া যায় না, ভক্তি রসে অবগাহিত হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। এরপর

আল্লাহ্ আল্লাহ্- ছয়শতবার

‘আল্লাহ্ আল্লাহ্’ বলার সময় কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখবেন, এই দৃষ্টি যেন নড়াচড়া না হয় এবং খেয়াল করবেন, “আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমাকে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন?” এই ডাকের জ বাব শুনার জন্য দেলের কান সজাগ রাখবেন এবং বিশ্বাস করবেন। হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহ্ পাককে একবার ডাক দিলে, আল্লাহ্ পাক ১০ বার ডাকের জবাব দেন। পরে **৫ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত করবেন।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

১। জেকের করতে করতে কান্না আসে।
২। আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার জন্য মনে উদাসীন ভাব আসে।
৩। সুন্নতের তাবেদারী করতে মনে ইচ্ছা করে।
৪। শরীয়তের জন্য কুর’বান হতে মনে চায়।
৫। কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ নূরানী নকশায় রূহানী নজরে দেখা যায়।
৬। ক্বল্‌বের মধ্যে ‘ইল্লাল্লাহ্‌র’ নূরানী নকশা দেখা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কে যেন নিরবচ্ছিন্ন জেকের করে মা’লুম হয়। আর কোন কোন সময় মনে হয়, অনেক দূর হতে আল্লাহ্‌র জিকিরের শব্দ অজস্র ধারায় ভেসে আসে।
৭। কোন কোন সময় জিকির করতে করতে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

তৃতীয় সবক

হাব্‌সে দম

এই সবকে বসে মওতের খেয়াল করার পর, দ্বিতীয় সবক বা নফি এছবাতের সবকের অর্ধেক আদায় করবেন অর্থাৎ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্- ১০০ (একশত বার)
ইল্লাল্লাহ্- ২০০ (দুইশত বার)
আল্লাহ্ আল্লাহ্- ৩০০ (তিনশত বার)

তারপর সবক বন্ধ করে দিয়ে, চুপ করে বসে খুব খেয়াল করে একটা লোক মরণ থেকে কবরে নিয়ে মাটি দিয়ে আসা পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খুব খেয়ালে খেয়ালে চিন্তা করতে থাকবেন। প্রথম সবকে মরণের যে খেয়াল করা হয়েছে, সেই সমস্ত খেয়াল করে খুব গভীরভাবে মনকে বুঝাবেন যে, মন এখন চিন্তা করে দেখ, তুমি বাড়ীর উঠানে নেমে উত্তর শিয়র হয়ে আছ, এখন তোমাকে গোসল দেয়া হয়, কে কে গোসল দেয় খেয়াল করবেন, এখন তোমাকে কাফন পরিয়ে জানাজা দিয়ে দুয়ারে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তোমার বিবি এখন সাদা কাপড় পরে বিধবা বেশে নাকের সোনা, হাতের চুঁড়ি খুলে তোমার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে আর বলে, আমায় তুমি কি দিয়ে গেলে? এখন খেয়াল করেন, আপনাকে কবরের দিকে নিয়ে যায়, আপনার ছেলেমেয়েরা পেছনে দৌড়ায় আর ‘আব্বা আব্বা’ বলে কাঁদে। এরপর খেয়াল করবেন, আপনার মরণের খাট নিয়ে কবরের এক পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কবরে নামানো হল। এখন আপনার সন্তান আপনাকে কবরে রেখে লাফিয়ে কবরের উপরে উঠল। কিতাবে আছে, সন্তান যখন পিতা-মাতাকে কবরে রেখে উঠে আসতে চায়, তখন ঐ পিতামাতার রুহ্ সন্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, বাবা আমাকে একলা ফেলে যেওনা। এখন আপনার কবরের উপরে মাটি ফেলে চাপা দেয়া হল, সবাই বিদায় হয়ে গেল। এখন মুন্‌কার নাকীর দু’জন ভীষণ দর্শন ফেরেশ্‌তা কবরে হাজির হল, তাদের হাতে গুর্জ্জ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন, সারা দুনিয়ার জ্বীন এবং মানুষ একত্রে চেষ্টা করলেও একটি গুর্জ্জকে একটুও নড়াতে পারবে না। এখন ফেরেশতা দু’জন গুর্জ্জ উঠিয়ে আপনাকে বসিয়ে আপনার ডান এবং বাম কাঁধের দিকে দাঁড়িয়ে আপনাকে সওয়াল করতে উদ্যত হল, আপনি এখন খেয়াল করবেন যে, তাদের সওয়ালের জবাব দিতে না পারলে, এই অন্ধকার কবরে গুর্জ্জের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব। আপনি এখন মনকে বুঝাবেন, মন! এই ভীষণ অন্ধকার কবরে এখন তোমার কে আছে, চিন্তা কর! এখন তোমার আল্লাহ বিনে কোন বান্ধব নেই, এই খেয়ালে আপনি এখন তসবিহ্ হাতে নিয়ে একদমে যতবার পারেন

আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত আকুলভাবে ডাকবেন এবং দম বন্ধ করে ঘন ঘন করে বলবেনঃ

আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌..............আল্লাহ্‌ - ২১ দমে ২১ (একুশ) **বার** বলবেন। বলতে বলতে দেখবেন এক দমে কতবার 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলতে পারেন। দ্বিতীয় দমে প্রথম দমের চেয়ে আরও কিছু 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন। এইভাবে ২১টা দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলবেন, বলতে বলতে শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে, তবু বলা থামাবেন না। এক দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' যত বেশী মাত্রায় বলতে পারবেন, সবকে তত বেশী তাছির পাবেন। দিনে রাতে দমে দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌'র মাত্রা বাড়িয়ে বলতে থাকবেন এবং এক দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলতে বলতে এই কাজটি শেষ করতে পারি কিনা, বা এই গাছ থেকে ঐ গাছ পর্যন্ত এক দমে 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলে হেটে যেতে পারি কি না, খেয়াল করবেন সবকের সময় এমনভাবে আল্লাহ্‌ বলবেন, যেন মুনকার নাকীর আপনাকে প্রশ্ন করার সময় না পায় এবং 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' বলা যেন মুহূর্তের জন্য বন্ধ না হয়, আল্লাহ্‌কে ডাকতে ডাকতে যেন কিয়ামত জারী হয়ে যায়।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

* জেকের করতে করতে কোন সময় দেখবেন, ঘুম হতে জাগ্রত হলেও আপনার জিহ্বা আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একা একা নড়াচড়া করে আল্লাহ্‌র জিকিরে রত আছে।
* খেয়াল করলে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্ট বস্তু থেকে আল্লাহ্‌ জিকির স্পষ্ট শুনতে পাবেন। বিবিকে খাছ পর্দা করে এবং সুন্নতি লেবাস নিয়ে এই জিকির বেশী মাত্রায় করলে, দেহের ছত্রিশ কোটি পশমের গোড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র জিকির বের হতে থাকবে, আখেরাত এবং কবরের অন্ধকারের কথা প্রাণে সদা জাগ্রত থাকবে। এই সবকে ভেতরের হালাত কোন কোন সময় এরকম হবে, দেখবেন, নাভী হতে দেহের উপরের অংশ কোটি কোটি মাইল উর্ধ্বদেশে উঠে গিয়েছে। নাভীর নিচের অংশটুকু জমিনে পড়ে আছে। আরও অন্যান্য হালত হবে, যেগুলো বর্ণনা করা নিষেধ।

এ সবকগুলোর পরে আরও **সতেরটি সবক** রয়েছে। যেগুলো করলে মানুষের কি যে হালত হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে কি রকম গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা বই পুস্তকে লিখে মোটেই প্রকাশ করা যাবে না।

বিঃ দ্রঃ সবকের অধ্যায়ে যে সবক লিখা হয়েছে, তা থেকে প্রথম সবক করার এযাযত দিলাম। এই সবক করতে করতে যদি কারো চোখে পানি আসে এবং দিল পরিবর্তন হয়, তাহলে এ গোলামের গরীবালয়ে যোগাযোগ করে এলমে মা'রেফতের উপরের নেয়ামতের সবক নেবেন।

- **মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে প্রতি বাংলা মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয় ও এল্‌মে মা'রেফতের শিক্ষা দেয়া হয়।**
- **বছরে দু'বার এলমে মা'রেফতের ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫, ৬, ৭ অগ্রহায়ণ ও ১০, ১১, ১২ই ফাল্গুন। (প্রয়োজনে তারিখ পরিবর্তন করা হয়)।**
- **প্রতি ইংরেজী মাসের ৩ ও ৪ তারিখে সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্‌কা শরীফে ইসলামী মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়।**

কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)
এর বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মন্‌যুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাওয়ার রাস্তা
ঢাকা আরিচা রোডে মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে নেমে রিকশায় সিদ্দিক নগর।
ফোন ঃ ০৬৫১ - ৬১৩৪৮

সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খানকা শরীফে যাওয়ার রাস্তা
স্বাধীনতা স্মরণী সড়ক, উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা। ফোন ঃ ৮৮২ ৭৩৩২
(উত্তর বাড্ডার মেইন রোডের পার্শ্বে হোসেন মার্কেট থেকে বামে স্বাধীনতা স্মরণী রোডের মাঝামাঝি । উপশম হাসপাতালের বিপরীতে)

দু'টি কথা

ধর্মের মূল হচ্ছে বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে কয়েকটি বিশ্বাস না থাকলে তাকে ঈমানদার বলা যাবে না এবং সে কাফের হবে। যেমন কবর আযাব কেউ বিশ্বাস না করলে সে কাফের হবে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কে বিশ্বাস না করলে তার কোন নেক আমলই কাজে আসবে না। এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক জাহেলদের মত চিন্তা ভাবনা করে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবী ছিলেন না, কবি ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্)। কেননা তিনি যে বলেন কবর আযাব সত্য কিন্তু তিনি আরো বলেন কৃপণ ব্যক্তিকে সাপে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াবে যে সাপটির বিষের চোটে চক্ষু নীল হয়ে গেছে এবং মাথার পশমগুলো পড়ে গেছে। একটা লোকের মৃত্যুর পর হাড়গুলো মাটিতে মিশে যায়। ঐ লোকটার বুকটা কোথায় থাকে, সাপটাইবা কোথায় দংশন করে। এ ছাড়া হিন্দুরা পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দেয়। এই ধরণের মন্তব্য নাস্তিকেরা ও তথাকথিত জ্ঞানান্ধরা করে থাকে। এই সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তির সদুত্তর নিখাঁদ বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে একটি বই লিখে দিয়েছি। তার নাম "মহাস্বপ্ন"।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

বাংলাদেশ (Bangladesh)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮
E-mail: sfbd786@mailblocks.com

ঢাকা কার্যালয়
সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্‌কা শরীফ
স্বাধীনতা স্বরণী সড়ক, সিদ্দিকনগর, বাড্ডা, ঢাকা
ফোনঃ ৮৮২৭৩৩২

জামি'আ আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮

মডার্ন বুক সেন্টার
১, মিরপুর রোড (ইসলামিয়া মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ৮৬১৯৭৯০

সোনিয়া মেডিকেল বুক হাউজ
২৪, মিরপুর রোড, (ইসলামী মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ০২-৮০১৪৩৫

কুষ্টিয়া সীড স্টোর লাইব্রেরী
(মিরপুর ১১ নং বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন) ঢাকা
ফোনঃ ৮০১১৪৩৫

ভূঁইয়া কনফেকশনারী
পূরবী সুপার মার্কেট, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা
ফোনঃ ০১৭১-১৪৮৫০৮

উজ্জ্বল বই বিতান
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১২ ৩৬০৪

অফিস ইন্টারলিংক
২৭১/১ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোনঃ ৮১২ ০০১৭, ৮১৫ ০১৭০

আবদুল্লাহ্
জেনেসিস প্রাঃ লিঃ
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা
ফোনঃ ০১৮-৪৯৩৬৩৭
E-mail: genesisl@bdcom.com

INDIA (ভারত)

Techno World
(Exclusive Distributor in India)
Block B, Shop 54, College Street Corpn.
Market, Kolkata-700 007 (Beside Bibhuti Hotel)
Tel: 91-33- 2219-6116
E-mail: technoworld786@vsnl.net

UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd.
8/1-B, Chowringhee Lane, Kolkata-700 016
Tel: 91-33-22521821, 22522910,
Fax: 91-33-22523027
E-mail: ubspdcal@cal.vsnl.net.in

National Book Store
15, Bankim Chattojee Street, Kolkata-700 073
(Opposite of Kolkata Presidency College)

Sarvodaya Book Stall
Howrah Station
(Old Complex, Near Main Enquiry)
Howrah-711101 (W.B)

Biswas Book Stall
88 U. G. Road, Kolkata-700 009

International Book Trust
54 College Street, Kolkata-700 073

M/s. Preface Books
Mumbai, India

UBSPD
New Delhi & Bangalore

ITALY (ইটালী)

Rashid Communications
VIA Goito, 7/a, 40126 Bologna
Italy, Tel: 051-273021

Carto Livreria
VIA - La- Marmora - 16
0085 Roma
ITALY, Tel: 06-441133

লেখকের গ্রন্থসমূহ

❒ **মহাভাবনা** (MOHA VABNA) **(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)**
এ মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বে এই প্রথম মহান আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ (The World Challenge) করা হয়েছে, যা বিশ্বের নাস্তিকরদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে । কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মীয় এ মহাকিতাবে মহাসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), গণিত (Mathematics), ইত্যাদির আলোকে আলোচনা করেছেন। এতে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে।

❒ **মহাস্বপ্ন** (MOHA SHAPNA)
হুজুরপাক (সাঃ) এর পর থেকে প্রায় **১৫**শত বছর পর তাঁর একটি সহি হাদিস শরীফের সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমানের মাধ্যমে **১৯৮৬** সালে নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing and one man divided into core of cores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings) আবিষ্কার করেছেন যা বিজ্ঞানের মতধরাকে পরির্বতন করবে। মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুড়িয়ে, মুসলমান ও খৃষ্টানরা মাটিতে গলিয়ে দিলেও কিভাবে কৃপন ব্যক্তির বুকে সাপে কামড়ায় তার প্রমাণ করা হয়েছে।

❒ **জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব** (JIBON RAHASHA O DEHA TATTA)
জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্‌পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

❒ **বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা** (BIGGANER DRISTITAY PARDA)
বেপর্দা নারীর স্বামীর কি যে সর্বনাশ হয় এবং সে কিভাবে যে অতিসত্বর পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে তা বিজ্ঞান এবং ডাক্তারী শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ কিতাব পড়ে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছেন। এমনকি অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত বোরখা পরে পর্দা করা শুরু করেছেন।

❒ **ধূম পিপাসা সর্বনাশা** (DHUM PIPASA SHARBANASHA)
ধূমপান করলে কি সর্বনাশ হয়, ডাক্তারী শাস্ত্রে তা দেখানো হয়েছে। ধূমপান করলে যে ক্ষতি হয়, তা নষ্ট করার কায়দা দেখানো হয়েছে এবং কি উপায়ে ধূমপান করলে ক্ষতি হয় না এবং ধূমপান কিভাবে ত্যাগ করা যায়, তার একটি অব্যর্থ উপায় লিখে দেয়া হয়েছে। এটা বহু পরীক্ষিত।

❒ **পীর ধরার অকাট্য দলিল** (PEER DHARAR AKATTA DALIL)
অনেকে বলে, পীর ধরার দরকার নেই। এসব কথার সদুত্তর কুর'আন শরীফ থেকে অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পীর না ধরলে মানুষ আল্লাহ্‌কে চিনতে পারবে না এবং মা'রেফতের জ্ঞান লাভ করতে পারবে না, অবশ্য আল্লাহ্ পাক ইচ্ছে করলে সবই পারেন। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্‌র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করা হয়েছে।

❒ **তারানায়ে জান্নাত** (TARANA- A- JANNAT)
বিচ্ছেদ বেদনাতুর হয়ে ঝংকৃত, কাব্যিক রসে স্নাত, ছন্দের দ্যোতনায় আপ্লুত অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব যা সালেককে আল্লাহ্‌পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। মা'রেফত পন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব এই বইটিতে গজল আকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

❒ **মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব** (MAREFATER VEDTATTA)
মা'রেফতপন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্বসম্বলিত ও চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার সবকসমূহ এবং সাজরানামা সম্বলিত কিতাব। এটি সালেকদের পাঠ্য বই।